বর্তমান যুগের

ইতিবৃত্ত



New Syllabus in History for Class VIII for academic session 1983 and onwards.
[Vide circular No. Syll./82/5 dated 21. 9. 82.]

বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত

[অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য]

Resubmission
No. H/VIII/82/62 Dt. 29. 12. 82.

ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী
ও
মৃদুচ্ছন্দা রায়চৌধুরী (পালিত)
অধ্যাপিকা, বিবেকানন্দ মহিলা কলেজ
বড়িষা, কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান বুক কন্‌সার্ন
৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রতুলচন্দ্র ঘোষ
ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন
৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ষষ্ঠ মুদ্রণ—ডিসেম্বর ১৯৮৬
পুণর্মুদ্রণ : জানুয়ারী ১৯৮৮
(নূতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী)

(বাজার হইতে ক্রয় করা কাগজে মুদ্রিত)

মূল্য ঃ ষোল টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
অটোটাইপ
পি-২৫৬এ, সি আই টি স্কিম ৬ (মানিকতলা)
কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

সূচীপত্র

১ ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনা

ইউরোপের পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ঃ

একটা নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনো যুগের সূচনা হয়েছে এমন বলা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ একযুগ থেকে অপর যুগে পৌঁছাতে গেলে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির প্রয়োজন। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি সব দিক দিয়েই সেই প্রস্তুতি চলতে থাকে। তবে যুগপরিবর্তনের সময় যেসব কারণ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে তার মধ্যে অর্থনীতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যযুগে যে সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতি প্রচলিত ছিল তার নাম 'সামন্ততন্ত্র'। এই ব্যবস্থায় অর্থনীতি ছিল গতিহীন। গ্রামের মানুষ চাষ-আবাদ নিয়ে থাকতো। গ্রামেই আবার অপরাপর জিনিস উৎপন্ন হ'ত যার দরুন বাইরে থেকে কিছু কিনে আনবার প্রয়োজন অনুভূত হ'ত না। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামই ছিল সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। ক্রমে সেই অর্থনীতিতে পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন ঘটায় এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় মাল চলাচল হতে থাকে। কোন জায়গায় একটি জিনিস না পাওয়া গেলে অন্য জায়গা থেকে তা আনিয়ে সেই চাহিদা পূরণ করা হয়ে থাকে। এই ব্যবসায়িক লেন-দেন আগেকার অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছিল।

কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাই নয়। এই সূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন কৃষির উন্নতি এবং শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন। সামন্তযুগের শেষ দিন থেকে দেখা যায় অনেক জমিতে চাষ-আবাদ করা সম্ভব হচ্ছে। কারণ সেই সময় উন্নত পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ চলতে থাকে। আবার নতুন নতুন ফসল যেমন ভুট্টা, বার্লি প্রভৃতির চাষ শুরু হবার ফলে উৎপাদন আগের তুলনায় অনেকখানি বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয়। ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হ'ল লোহার তৈরী ফলার সাহায্যে কৃষি-কাজ করা। এই ধরনের লাঙল ব্যবহারের ফলে জমিকে আরও গভীরভাবে চাষ করা সম্ভব হয়েছিল।

সামন্তযুগে ইউরোপে জল ও বায়ুচালিত কল ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল। কালক্রমে এই দুটো জিনিস সামন্তব্যবস্থায় কৃষিকাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন এর ব্যবহার আরও ব্যাপক ভাবে শুরু হয় এবং উন্নত জলের কল ব্যবহৃত হওয়ায় কৃষিভূমিতে জল সরবরাহ সহজ হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে লোহার পিণ্ড গলাবার জন্য ব্লাষ্ট ফার্নেস আবিষ্কৃত হয়। এর ফলে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। নতুন নতুন শিল্পজাত দ্রব্য তৈরী হতে থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে গিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

উপরে যেসব নতুন নতুন পরিবর্তনের কথা বলা হ'ল তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সামাজিক সম্পর্ক ক্ষেত্রে নতুন শক্তি আবির্ভূত হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে উৎপাদনী শক্তির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সামন্তযুগের উৎপাদনশক্তির সঙ্গে নতুন উৎপাদনী শক্তির পার্থক্য ঘটায় যে নতুন সামাজিক শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল তাকে মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া সম্প্রদায় বলা যেতে পারে। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বলা যায় সামন্ত অর্থনীতির পরিবর্তে জন্মলাভ করেছিল নতুন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি। এই নতুন অর্থনীতির মূল কথা হ'ল মুনাফা বা লাভ করা। যে যত পুঁজি বিনিয়োগ করবে সে তত অর্থলাভ করতে পারবে। পুঁজি বিনিয়োগ করে নতুন নতুন যন্ত্রপাতির সাহায্যে মজুরদের দিয়ে কাজ করানো এই নতুন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। মজুররা মজুরী পাবে এবং পুঁজিপতি লাভের অংশটা আত্মসাৎ করবে।

২ ইউরোপে নবজাগরণ

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ঃ

ফরাসী শব্দ 'রেনেসাঁস' বলতে বোঝায় নবজন্ম বা নবজাগরণ। মধ্যযুগের শেষ দিকে ইউরোপের মানুষের মধ্যে যে চিন্তার স্বাধীনতা দেখা দিয়েছিল, প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতাকে নতুন করে জানবার আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তা-ই রেনেসাঁসের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিল বলা যেতে পারে। কারণ এই আগ্রহ থেকে মানুষ নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল। মানুষ বুঝতে শিখেছিল যে, কোন ধর্মকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকবার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই।

১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী আক্রমণের ফলে কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটেছিল। এই আক্রমণের সময় সেখানকার যত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা তাঁদের পুঁথিপত্র নিয়ে ইতালির শহরগুলোতে পালিয়ে চলে এসেছিলেন নিরাপত্তার জন্য। সেখানে আসবার পরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের অধ্যাপনার কাজে নিয়োগ করা হয়। ইতালির নগরগুলো রেনেসাঁসের জন্মস্থান হবার অবশ্য আরও কতকগুলো কারণ আছে।

ইতালি ছিল প্রাচীন রোমান সভ্যতার কেন্দ্র। গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের ইতালির মানুষ একেবারে ভুলে যায়নি। তাছাড়া মধ্যযুগের শেষদিকে ইতালির নগরগুলো ইউরোপের সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার দরুন সেখানে নবাগত পণ্ডিতরা সহজেই নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, মিলান, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতি শহরে এক শ্রেণীর মানুষ ব্যবসায়-বাণিজ্য করে বিত্তশালী হয়ে উঠেছিলেন। এঁরাই ছিলেন রেনেসাঁসের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। এইসব ধনিকশ্রেণীর উৎসাহে এখানে নামকরা সব সাহিত্যিক, চিত্রকর, শিল্পী প্রভৃতির সমাবেশ হয়েছিল।

রেনেসাঁসের মূল কথা, গতানুগতিকতার পরিবর্তে নতুন চিন্তাধারার বিকাশ। মধ্যযুগে মানুষের চিন্তাধারা ছিল বদ্ধ কূপের মত। চার্চের প্রভাবে মানুষের চিন্তা-গতি হারিয়েছিল। মানুষ তখন ভাবতো যে, নতুন কিছু চিন্তা করা, নতুন কিছু জানবার স্পৃহা—সবকিছুরই অর্থ হ'ল ধর্মদ্রোহিতা। চার্চও এই নিয়মকে প্রশ্রয় দিত যাতে চার্চ তার প্রাধান্য বজায় রাখতে পারে। বাইবেল

পড়বার অধিকার সাধারণ মানুষের ছিল না। যাজকদের ব্যাখ্যাকেই বাইবেলের শেষ কথা বলে মেনে নেবার রীতি প্রচলিত ছিল। এইভাবে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা সবকিছুকে নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করবার রীতি থেকে মানুষের মন একেবারে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল।

মধ্যযুগের শেষভাগে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে যে নতুন সামাজিক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে তাদেরকে কিন্তু উপরিউক্ত চার্চের অনুশাসন সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তারা জীবনের উন্নতি চায়। তারা চায় সেই সব বিদ্যা অনুশীলন করতে যা নাকি তাদের জীবনে উন্নতি ঘটাবে, তাদের সুবিধা হবে। এই নতুন শ্রেণীর তাই আগ্রহ বাইবেল বা ধর্মকর্মে নয়, তাদের আগ্রহ নতুন নতুন বিদ্যার অনুশীলন। এই আগ্রহ, এই প্রচেষ্টা থেকেই মধ্যযুগের শেষ দিকে শুরু হয়েছিল ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র সৌন্দর্যচর্চা প্রভৃতির অনুশীলন। এইসবের অনুশীলনের সূত্রে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানুষের চিন্তাধারার এক নতুন দিক খুলে দিয়েছিল। মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে যুক্তিবাদী মন নিয়ে জীবনের অনুসন্ধানের মধ্যেই বেঁচে থাকবার সার্থকতা। এই মনোভাব থেকেই মানুষ হয়ে উঠেছিল অনুসন্ধিৎসু। কোনো অনুশাসনকে মেনে নেবার আগে তাকে যাচাই করে নেবার মনোভাব মানুষকে পেয়ে বসেছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে রেনেসাঁসের জন্মস্থান ইতালি। ইতালির বণিক সম্প্রদায় রেনেসাঁসের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে ইতালিতেই রেনেসাঁস শুরু হয়েছিল। ইতালি থেকে রেনেসাঁস-এর বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমে ইতালির বাইরে ছড়াতে থাকে। আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করে রেনেসাঁস ফ্রান্স, জার্মানি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতালির মেদিচি পরিবার এই রেনেসাঁসের আন্দোলনের বড় সমর্থক ছিলেন। কেবল তাই নয়, ইতালির ধনিকদের মধ্যে সেই সময় রেনেসাঁসের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে যেন এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল। যাই হোক, জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতালির অনেক অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন অধ্যাপনার জন্য। ইরাসমাস বলেছেন যে, এগ্রিকোলা নামে জনৈক ব্যক্তিই প্রথম রেনেসাঁসের নতুন চিন্তাধারা ইতালির গণ্ডির বাইরে এনেছিলেন। এগ্রিকোলা জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

ফ্রান্সের অষ্টম চার্লস একবার ফরাসী সৈন্য নিয়ে ইতালির নেপলস্ শহরে অভিযান চালিয়েছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ইতালির রেনেসাঁস আন্দোলনের

সংস্পর্শে আসেন। এইভাবে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইতালীর রেনেসাঁস ফ্রান্সে অনুপ্রবেশ করেছিল। তারপর থেকে একে একে অনেক স্বনামধন্য পণ্ডিতরা প্যারিস শহরে সমবেত হন এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। চসার ছিলেন ইংলণ্ডে রেনেসাঁসের বাহক। তিনি ধর্মকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে অনেক ধর্ম-নিরপেক্ষ বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল।

মানবতাবাদ :

রেনেসাঁস যুগে যাঁরা আধ্যাত্মিক বিষয় চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে মানুষের যোগ্য বিদ্যার অনুশীলন শুরু করেন তাঁদেরকেই 'মানবতাবাদী' বলা হয়।

রেনেসাঁস যুগের প্রথম পুরোহিত ছিলেন দান্তে। ইতালীয় কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হিসাবে যুগপৎখ্যাত দান্তের দীক্ষাগুরু ছিলেন ল্যাটিন কবি ভার্জিল। তাঁর প্রেরণা ছিল গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ছিল 'ডিভাইন কমেডি'। কল্পনা, প্রহসন ও হাস্যরসের মধ্য দিয়ে দান্তে যে অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন 'ডিভাইন কমেডি' তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।



ম্যাকিয়াভেলী



দান্তে

নিকালো ম্যাকিয়াভেলী একজন বিখ্যাত ইতালীয় লেখক ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ফ্লোরেন্সের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (১৪৬৯ খ্রীঃ)। ম্যাকিয়াভেলীর অভিমত ছিল, রাজনীতিতে নীতিশাস্ত্রের স্থান খুবই নগণ্য। তিনি বলতেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-কোন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। ম্যাকিয়াভেলীই ছিলেন আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম মানুষ।

ইতালীয় অমর কবি পেত্রার্ক ও কাহিনীকার বোকাচিও ফ্লোরেন্সের অধিবাসী ছিলেন। একথা বলা যেতে পারে যে, কবি পেত্রার্কের প্রচেষ্টাতেই ইতালিতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিল্প এবং সাহিত্যের চর্চা প্রবল হয়ে উঠেছিল। পেত্রার্ককে সেইজন্য ইতালীয় রেনেসাঁসের 'প্রথম তারকা' বলা হয়। গ্রীক ও ল্যাটিনের প্রতি পেত্রার্কের অসাধারণ প্রীতি ছিল।


পেত্রার্ক

বিখ্যাত কাহিনীকার বোকাচিও নবযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর অমূল্য রচনা হ'ল 'ডেকামেরন'। ঐ গ্রন্থে বোকাচিও যাজকদের জীবন ও তৎকালীন সমাজের কুৎসিৎ দিকটা ফুটিয়ে তুলে জনসাধারণকে তা পরিবর্তনের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন।


বোকাচিও

ফ্রান্সিস বেকন ছিলেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদ। রাজনীতির সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 'নোভাম অরগানাম' 'এসেস্' প্রভৃতি বেকনের বিখ্যাত রচনা। তাঁর রচনা রেনেসাঁস যুগে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। কারণ তাঁর যুক্তিবাদী চিন্তাধারা মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চার আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল।

চসার ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল। তিনি সারা জীবন ধরে যে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তাঁর রচনাগুলি তারই অভিব্যক্তি। সমসাময়িক আমলের সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি চসারের লেখনীর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। এডমাণ্ড স্পেন্সার ছিলেন অপর একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। 'ফেয়ারী কুইন' তাঁর বিখ্যাত রচনা।

ইংলণ্ডে কিভাবে রেনেসাঁস আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে। সেই আন্দোলন ইংরেজদের জাতীয় জীবনকে যে কতখানি উজ্জীবিত করেছিল তা সমসাময়িক সাহিত্যসৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায়। ইংলণ্ডে নবযুগের পুরোভাগে ছিলেন উইলিয়াম শেক্সপীয়ার। 'হ্যামলেট' 'ম্যাকবেথ', 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' প্রভৃতি তাঁর অমর রচনা। শেক্সপীয়ারের রচনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল এই যে, তাঁর নাটকে মনুষ্য চরিত্রের যে চিত্র ফুটে ওঠে বিশ্ব-সাহিত্যে তার তুলনা পাওয়া কঠিন।



শেক্সপীয়ার

হল্যাণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত ইরাসমাস ডেমিডেরিয়াস রেনেসাঁস যুগের মানবতাবাদের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি একজন যাজক হওয়া সত্ত্বেও লেখক হিসাবেই তিনি বেশী সুপরিচিত। সমসাময়িক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি কুসংস্কারে নিমজ্জিত ধর্মযাজকদের বিদ্রূপ করতেন। একাধিক রচনায় তিনি ধর্মের কতকগুলি মিথ্যা আচার-আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ঐগুলি নিরর্থক। 'প্রেইজ অফ ফলি' তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলির অন্যতম।

নবজাগরণের যুগে স্পেনও পিছিয়ে পড়েনি। স্পেনের অমর সাহিত্যিক সারভান্তেস্ ঐ যুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অমর গ্রন্থের নাম 'ডন কুইক্সট্'। এই গ্রন্থে তিনি মধ্যযুগীয় সমাজকে নিন্দা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলেন যাতে মানুষের বোধোদয় হয়। শিল্প-সাহিত্যে আলোচ্য সময়ে ফ্রান্সে যাঁরা জন্মগ্রহণ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে রাবেল-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, রাফায়েল ও মাইকেল এঞ্জেলো সমসাময়িক ছিলেন। ইতালির এইসব চিত্রশিল্পী ও স্থপতি দেশ-বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছেন।

আগেকার দিনে প্রাসাদ ও চার্চের গায়ে নানা রকমের ছবি আঁকা থাকতো।



লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি



রাফায়েল

ঐগুলিকে ফ্রেস্কো বলা হত। এইসব দেওয়াল চিত্র থেকে এঁদের শিল্প-প্রতিভা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়।

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জায়গার রাজপরিবার তাঁকে নানাভাবে উৎসাহ জুগিয়েছিল। এইসব পরিবারের মধ্যে মিলানের সফরজা পরিবার, ফ্লোরেন্সের মেদিচি পরিবার এবং ফ্রান্সের রাজপরিবারের নাম করা যেতে পারে। 'লাস্ট সাপার' এবং 'মোনা লিসা' তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন বলা যেতে পারে। লিওনার্দো বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ছবি আঁকতেন। মানুষের দেহের গঠনবস্তু সম্পর্কে খুবই পরিষ্কার ধারণা ছিল বলে তিনি প্রত্যেকটি ছবিকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছিলেন। লিওনার্দো একজন ভাস্কর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।



মাইকেল এঞ্জেলো

মাইকেল এঞ্জেলো লিওনার্দোর মতই ফ্লোরেন্সের বাসিন্দা ছিলেন। শিল্পী হিসাবে তিনি সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কারণ তিনি যে বিভিন্ন বিষয়ে

পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন সেইরকম আর কেউ দেখাতে পারেন নি। তিনি একাধারে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি কবি এবং বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ফ্লোরেন্সের মেদিচি পরিবার এবং একাধিক শিল্পানুরাগী পোপের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ফ্লোরেন্সের 'ডেভিড'-এর মূর্তি তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। তাছাড়া সেণ্টপিটার্স গীর্জা নির্মাণে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর আঁকা 'শেষ বিচার' সম্ভবতঃ শিল্পজগতের একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

রাফায়েল মাইকেল এঞ্জেলো থেকে বয়সে ছোট হলেও চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি অনেক উপরে ছিলেন বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। রাফায়েল তাঁর জীবনের বেশীর ভাগই রোমে অতিবাহিত করেছিলেন। সেখানে তিনি ভ্যাটিকান, অর্থাৎ পোপের প্রাসাদকে সাজাবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

মধ্যযুগে বিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়নি এমন নয়, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা রেনেসাঁসের সময় থেকেই হয়েছিল বলা যেতে পারে। মধ্যযুগে বিজ্ঞানচর্চায় নানা বাধা ছিল। সেইসব বাধা কাটিয়ে উঠে আধুনিক বিজ্ঞানের পথ পরিষ্কার করতে হয়েছিল। কারণ সেই আমলে কুসংস্কারকেই মানুষ বেশী গ্রহণযোগ্য বলে মনে করত। বিজ্ঞানীদের সেই আমলে নাস্তিক বলে আখ্যা দেওয়া হ'ত। কিন্তু রেনেসাঁসের সময় মানব-সংক্রান্ত সব বিষয়ে যখন গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে তখন যুক্তি-নির্ভর বিজ্ঞানও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করতে থাকে।

ষোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য কয়েকটি কারণ দায়ী ছিল। সেই সময় ধর্ম তার একচেটিয়া আধিপত্য ক্রমশঃ হারাতে বসেছিল। মানবতাবোধ জাগ্রত হওয়ায় মানুষ পারলৌকিক জগৎ অপেক্ষা ইহজগতের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। ইতিমধ্যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন পোপের একচেটিয়া অধিকারকে বিশেষভাবে আঘাত করেছিল। এইসব কারণে আলোচ্য সময়ে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছিল বলা যেতে পারে।

মধ্যযুগীয় অলৌকিকতার বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ফ্রান্সিস বেকন। তিনি বলেছিলেন যে, প্রাচীন যুগে যে সব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আবিষ্কৃত হয়েছিল তাতে অনেক দোষ-ত্রুটি আছে সুতরাং সেইগুলোকে আবার যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেছিলেন যে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের দৃষ্টি ফেরাতে পারলে তবেই বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি ঘটতে পারে।

ইংরেজ বিজ্ঞানী রোজার বেকন ছিলেন সমসাময়িক যুগের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। গণিতশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। এই নানাবিধ জ্ঞানের জন্য তাঁকে 'বিস্ময়কর পণ্ডিত' বলা হ'ত।

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি বিজ্ঞানী হিসাবেও সুপরিচিত ছিলেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ছিল। উত্তর ইতালিতে একটি নদীর খাল খনন করবার ব্যাপারে এবং মিলানের সুরক্ষার জন্য তাঁর পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল। তিনি যে সেই আমলের কত বড় বিজ্ঞানী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় লিওনার্দোর আঁকা নক্সা থেকে। তিনি অনেকগুলো যান্ত্রিক সিংহ তৈরী করেছিলেন। এই যান্ত্রিক সিংহগুলো ফরাসীরাজের মিলান সফরের সময় প্রদর্শিত হয়েছিল। উপরি উক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা মোটেই শক্ত নয় যে, লিওনার্দো তাঁর সমসাময়িক যুগকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিলেন সেই রকম আর কেউ করতে পারেন নি।

কোপারনিকাস ছিলেন পোল্যাণ্ডের একজন খ্রীষ্টান যাজক। তিনি ধর্মীয় কার্যকলাপ এবং ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। দু'রকমের পড়াশুনার জন্য তিনি সময় ভাগ করে নিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়ে আকাশের তারাগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন। আকাশের রহস্য নিয়ে তিনি একটা বই লিখেছিলেন এবং তাতে গাণিতিক হিসাব করে তার সিদ্ধান্তগুলো প্রমাণ করেছিলেন। কোপারনিকাসের সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে পরবর্তীকালের একাধিক বিজ্ঞানী অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন।



কোপারনিকাস

গ্যালিলিও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নানা ধরনের গবেষণা করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতিতে তাঁর দখল ছিল। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ও লেখক

হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গ্যালিলিও কোপারনিকাসের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে প্রমাণ করেছিলেন। পাড়ুয়া'র বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন তখন তা শোনবার জন্য মানুষ অধীরভাবে অপেক্ষা করতো। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন। তিনি যখন ঘোষণা করেন যে, সূর্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত তখন চার্চ তাঁকে মানতে অস্বীকার করে যার ফলে তাঁকে যাজকদের বিচারালয়ের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল।



গ্যালিলিও

মুদ্রণযন্ত্রকে, কোথায় এবং কিভাবে আবিষ্কার করেছিলেন তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে আমরা সঠিকভাবে একথা বলতে পারি যে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে গুটেনবার্গ নামে জনৈক ব্যক্তি টাইপ ব্যবহারের মাধ্যমে ছাপাখানায় মুদ্রণ করবার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। গুটেনবার্গ জার্মানির মেইজ নামক স্থানে প্রথম ছাপাখানা তৈরী করেছিলেন। গুটেন-বার্গের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল তিনিই প্রথম বাইবেলের অনুবাদ করে বই ছেপে বের করেছিলেন (১৪৫৪ খ্রীঃ)। এইভাবে মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে বই বের করবার পরে জার্মানির সর্বত্র ছাপা বই বের হতে থাকে এবং ক্রমে তা ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।



গুটেনবার্গ

৩ ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার

ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ ঃ

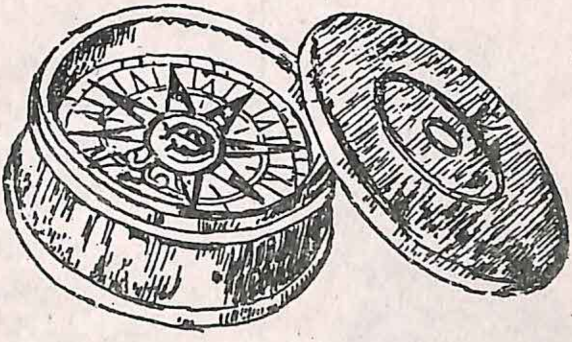
মধ্যযুগের যানবাহনের অসুবিধার জন্য দেশ বিদেশে যাতায়াত করা মোটেই সহজ ছিল না। সেই সময় অবশ্য যাতায়াতের প্রয়োজনও তেমন ছিল না। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ না থাকার ফলে এসবের প্রয়োজনীয়তা তেমন অনুভূত হয়নি। কিন্তু মধ্যযুগের শেষভাগে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূত্রে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল তেমনি যাতায়াতের উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ যাতায়াতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল।

মধ্যযুগে মানুষের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করা যে সম্ভব হয়নি তার পেছনে অনেকগুলো গুরুতর কারণ ছিল। সেই আমলে মানুষের ধারণা ছিল যে, পৃথিবী সমতলভুমি এবং আটলাণ্টিক মহাসাগর নরকের দ্বার। ক্রমে এই ধারণা মানুষের মন থেকে দূর হতে থাকে। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের উন্মাদনায় মানুষ যখন দূর দেশে যাতায়াত শুরু করেছিল তখন পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের ধারণা অনেকখানি পাল্টে গিয়েছিল। অন্যদিকে রেনেসাঁসের মাধ্যমে মানুষ সবকিছুকে জানবার, বোঝবার এক প্রেরণা পেয়েছিল। ফলে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে মানুষ বেরিয়ে পড়ে দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে।

অল্পকথায় বলতে গেলে, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের শাসনকর্তাদের উদ্যোগ, বণিকের অর্থলোভ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টা, দুঃসাহসিক কর্মে ব্যক্তিগত উন্মাদনা এবং নতুন দেশ আবিষ্কারের মোহ ছিল ভৌগোলিক আবিষ্কারের অন্যতম কারণ। তবে ধর্মের প্রেরণা এবং ধর্মযাজকদের আগ্রহও ভৌগোলিক আবিষ্কারের যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। ভৌগোলিক আবিষ্কার সহজ হয়েছিল কতকগুলো যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে। দিক্‌দর্শন যন্ত্র, নক্ষত্র পরিমাপক-যন্ত্র, সূর্য-ঘড়ি, এ্যাস্ট্রেল্যাবপ্রভৃতি যন্ত্র আবিস্কৃত হওয়ায়নিঃসন্দেহে ভৌগোলিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। কারণ ঐসব যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের মাঝখানে দিক নির্ণয়ের কাজ করা সম্ভব হয়েছিল, আর তাতে মানুষের অজানার ভাব দূরীভূত হয়েছিল। মানুষ জানতে পেরেছিল পৃথিবীর আকার।

মার্কোপোলোর ভ্রমণ-কাহিনী প্রাচীন মিশর ও গ্রীক নাবিকদের বাণিজ্য-যাত্রা প্রভৃতির কাহিনী জানতে পেরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বিভিন্ন

দেশের নাবিকের মধ্যে দেশ আবিষ্কারের উদ্যম দেখা দিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে পর্তুগাল ও স্পেনের নাবিকরা এই ব্যাপারে বিশেষ



নাবিকের কম্পাস

অগ্রণী হয়েছিল। এর আরও একটা বড় কারণ হল এই যে পর্তুগাল ও স্পেনের সঙ্গে সাগর ও সলিলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

প্রিন্স হেনরী-দ্য-নেভিগেটার-এর উদ্যোগে পর্তুগালের নাবিকরা ভৌগোলিক আবিষ্কারে উৎসাহ পেয়েছিল। বার্থলোমিউ দিয়াজ ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার সুদূর প্রান্তে ঝটিকা অন্তরীপ-এ পেঁছান। এই অন্তরীপ পরবর্তীকালে 'উত্তমাশা অন্তরীপ' নামে পরিচিত হয়। কারণ পরে এই পথেই ভারতবর্ষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। আলবুকার্ক ভারতবর্ষে এসেছিলেন ভাস্কো-দা-গামার অনেক পরে। তিনি ভারত মহাসাগর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে পর্তুগীজদের প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। তবে ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষে আসবার জলপথ আবিষ্কার করতে না পারলে আলবুকার্কের পক্ষে সেই প্রাধান্য বিস্তার মোটেই সম্ভব হত না। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা ভারতের পশ্চিম উপকূলে



হেনরী-দ্য-নেভিগেটার

অবস্থিত কালি কট বন্দরে জামোরিনের কাছে উপস্থিত হন। ভাস্কো-দা-গামার পরবর্তীকালে একেএকে আরও অনেক পর্তুগীজ বণিক ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং সেই জলপথ ধরে অপরাপরদেশের নাবিকরাওএদেশেউপস্থিত হয়েছিলেন।



ভাস্কো-দা-গামা

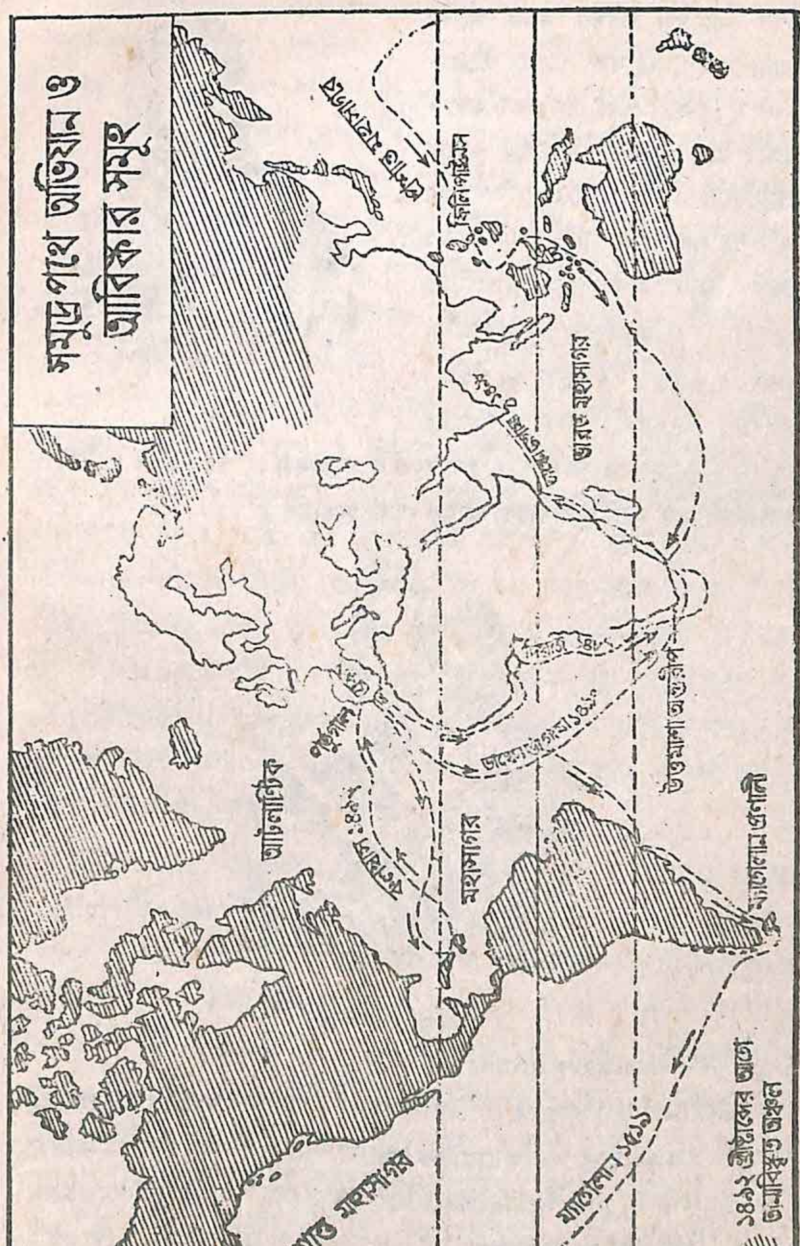
১৫০০ খ্রীস্টাব্দে পেড্রো ক্যাব্রাল একখানি জাহাজে করে ভারতবর্ষের দিকে রওয়ানা হয়ে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে পেঁছান। কাব্রাল ব্রাজিল-এ গিয়ে তাঁর তরী ভিড়িয়েছিলেন।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ব্যাপারে স্পেনের উদ্যম নিতান্ত কম ছিল না। জেনোয়াবাসী কলম্বাস ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষ ও মলাক্কাস দ্বীপে পেঁছাতে গিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলেন। কলম্বাস নিজে অবশ্য বুঝতেও পারেন নি যে তিনি আমেরিকায় এসে পেঁচেছেন, তাঁর আবিষ্কারের অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বালবোঁরা নামে জনৈক স্পেনীয় নাবিক প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল জলরাশিতে গিয়ে পেঁছান। তখনই মানুষ জানতে পেরেছিল যে পানামা যোজকের মধ্য দিয়ে দুই মহাসমুদ্রের মিলন হয়েছে।



কলম্বাস

'আমেরিকা' নামের উৎপত্তি হয়েছে ফ্লোরেন্স নিবাসী নাবিক আমেরিগো ভেসপুচির নাম থেকে। কলম্বাসের কাছ থেকে আমেরিকা


সমুদ্রপথে অভিযান ও আবিষ্কার সমূহ
আটলান্টিক
মহাসাগর
পর্তুগাল
প্রশান্ত মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
ফিলিপাইনস
উত্তমাশা অন্তরীপ
ম্যাগেলান প্রণালী
ম্যাগেলান ১৫১৯
১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের আগে অনাবিষ্কৃত অঞ্চল

সম্পর্কে বিশদভাবে জেনে নিয়ে অন্যান্য যেসব নাবিক আমেরিকায় পেঁছাবার চেষ্টা করেছিল তাঁদের মধ্যে আমেরিগো ভেসপুচির নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে অবতরণ করতে পেরেছিলেন। ম্যাগেলানের কৃতিত্ব হ'ল তিনি সর্বপ্রথম ভূ-প্রদক্ষিণ করেছিলেন। প্রথমে তিনি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে পেঁছান। সেখানকার অধিবাসীরা তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। তারপরে তাঁর সঙ্গীসাথীরা পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে আবার স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেছিল। তার ফলে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে মানুষের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়েছিল।



ম্যাগেলান



আমেরিগো ভেসপুচি

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল ঃ

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানের কথা। বিভিন্ন দেশ আবিষ্কার করবার ফলে মানুষের পৃথিবীর ভৌগোলিক ধারণা যেমন স্পষ্ট হয়েছিল তেমনি সে সুপরিচিত হয়েছিল বিভিন্ন দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত। এর দরুন বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে আদান-প্রদান সহজ হয়েছিল, পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে নতুন নতুন দেশ ইউরোপীয় বণিকদের সামনে উন্মোচিত হতে থাকে। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের লেনদেন বাড়তে থাকায় সামুদ্রিক বাণিজ্য-পথের গুরুত্বও অপরিসীমভাবে বৃদ্ধি পায়। আরও দেশ আবিষ্কার এবং আবিষ্কারের অঞ্চলগুলিতে বাণিজ্য বৃদ্ধির নেশা সৃষ্টি করে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক সম্পূর্ণ নতুন দিক। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ে সবচেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করে স্পেন ও পর্তুগাল। আফ্রিকায় পর্তুগীজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে এ অঞ্চলে আরব বণিকরা ক্রমশঃ পিছু হটতে থাকে। আবিষ্কৃত অঞ্চলগুলিতে বাণিজ্যের চেয়েও সম্পদ লুণ্ঠনের দিকেই স্পেনের নজর ছিল বেশী। ক্রমে ক্রমে এই বাণিজ্য ও লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতায় যোগ দিল ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ। বাণিজ্যের সংরক্ষণ, বিস্তার ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে বাণিজ্যের সঙ্গে রাজনীতি ও রাষ্ট্রশক্তিরও অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করল। বাজার দখলের প্রতিযোগিতা উপনিবেশবাদের জন্ম দিল। শুরু হল বাজার দখল, কাঁচামাল ও সম্পদ লুণ্ঠনের জন্যে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার লড়াই। বাণিজ্যিক বিস্তার ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল আধা-দস্যু একধরনের নাবিকেরা। তাদের কাজকর্মের পিছনে ছিল বিভিন্ন ইউরোপীয় রাজশক্তির সমর্থন। স্পেনের এই আধা-দস্যুদের নাম ছিল 'কংকুইস্টেডর'। আমেরিকা মহাদেশে মেক্সিকো ও পেরুতে স্পেনের দখল প্রতিষ্ঠা করে এরাই। দখলীকৃত অঞ্চল অবর্ণনীয় অত্যাচারের ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের এক বিপুল অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ভৌগোলিক আবিষ্কার জাতিসমূহের সংগঠন ও উত্থানের ক্ষেত্রে অন্যতম পূর্বশর্ত হিসাবে সহায়তা করে। আবিষ্কৃত দেশগুলিতে যে বিপুল বাণিজ্য ও সম্পদ লুণ্ঠনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে তা অনিবার্যভাবে জন্ম দেয় ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। নিজ নিজ দেশের রাজশক্তির ব্যাপক ও সক্রিয় সমর্থন ছাড়া এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলভাবে টিকে থাকা দুরূহ হয়ে উঠে। ব্যবসায়ীরা ও বণিকগোষ্ঠীগুলি চাইছিলেন স্ব স্ব দেশের রাজারা শুধু তাঁদের সাহায্য করুন তাই নয়, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করুন যাতে বহির্বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় দেশীয় প্রেক্ষাপটটি সুদৃঢ় হয়ে উঠতে পারে। তাঁরা চাইছিলেন রাজারা শক্তিশালী জাতির সংগঠনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করুন। ফলে এক এক রাজার নেতৃত্বে এক একটি শক্তিশালী জাতি আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

৪ ধর্মসংস্কার ও প্রতি-ধর্মসংস্কার আন্দোলন

ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার ও অন্যান্যদের প্রতিবাদ ঃ

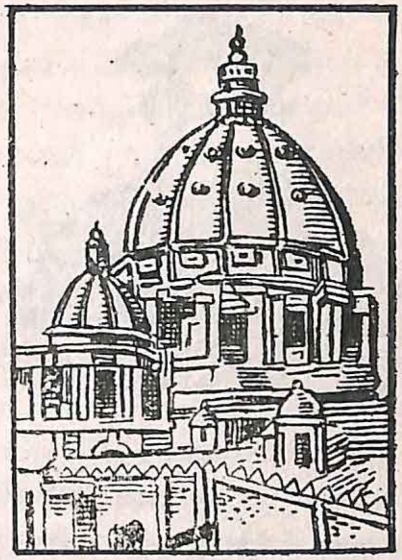
পঞ্চদশ শতাব্দীর নবজাগরণ আন্দোলন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার প্রভাব থেকে কোন দেশই মুক্ত থাকতে পারেনি। এক এক দেশে অবশ্য নবজাগরণের প্রভাব এক এক রকম হয়েছিল। আল্পস্ পর্বতের উত্তরের লোকেরা নবজাগরণের প্রভাবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিল, কিন্তু অপরাপর জায়গায় এই নবজাগরণ আন্দোলন মানুষের জীবনকে আনন্দময় করে তোলার দিকে ধাবিত হয়েছিল।

নবজাগরণ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা। এর ফলে মানুষ স্বাধীনভাবে সব কিছুকে যাচাই করে দেখতে শিখেছিল, আগেকার মত বিনা বিচারে সব কিছু মেনে নেবার পক্ষপাতী ছিল না। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প প্রভৃতিতে এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাব কি হয়েছিল তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এইবার দেখতে হবে যে নবজাগরণের প্রভাব ধর্মের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।

মধ্যযুগের চার্চের জীবনযাত্রার মান অনেকখানি নেমে গিয়েছিল। চার্চ মানুষের চিন্তাধারাকে যেমন সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি নানা ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করে ধর্মকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। ধর্ম সম্পর্কে একছত্র অধিপতি ছিলেন চার্চের লোকেরা। বাইবেলপড়া, তার ব্যাখ্যা করা সবকিছুই নির্ভর করত চার্চ-এর ওপর। ক্ষমতার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মানুষকে যেমন দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে তেমনি চার্চের মানুষও মধ্যযুগে হয়ে উঠেছিল দুর্নীতিপরায়ণ।

মধ্যযুগে চার্চের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হবার দরুনই ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। স্বয়ং পোপ বা ধর্মগুরু থেকে সাধারণ যাজক পর্যন্ত কেহই ঐসব দুর্নীতি থেকে মুক্ত ছিল না। যাজকরা

ছিলেন অশিক্ষিত। তাঁরা বিলাস-ব্যসনে সর্বদা লিপ্ত থাকতেন। দেশের অধিকাংশ জমির মালিক ছিলেন এই যাজকরা। যাজকদের অর্থ আয়ের উৎস ছিল অনেক। জনসাধারণের কাছ থেকে নানা অজুহাতে অর্থ আদায় করা ব্যতীত বাইবেলের নানা অপব্যাখ্যা করে চার্চের প্রতি মানুষকে বিশ্বস্ত রাখতে যাজকরা চেষ্টার ত্রুটি করতেন না। একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, জনসাধারণের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার একাজে বিশেষ সহায়তা করত। যাজকরা বলতেন যে, যদি কোনো পাপী চার্চকে অর্থ সাহায্য দান করে, তাহলে সেই পাপের শাস্তি থেকে সে মুক্ত হতে পারে। সেজন্য যাজকরা টাকা দিয়ে পাপীদের 'মার্জনাপত্র' কিনতে বাধ্য করত। ধর্মের নামে এই ধরনের নানা অত্যাচারে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল।



চার্চ (গীর্জা)

চার্চ তথা যাজকদের নানা ধরনের অন্যায়-অত্যাচার ও অর্থের দাবি জনসাধারণকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেও চার্চের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবার সাহস বা অধিকার কারো ছিল না। চার্চের বিরুদ্ধে কোন কিছু বললে শাস্তি পেতে হত। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অনেক সময় তাকে মৃত্যুবরণও করতে হত। চার্চের এইসব অনাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলে মানুষ যখন যুক্তির কষ্টিপাথরে সব কিছুকে বিচার করতে শুরু করল তখন মানুষের আর বুঝতে বাকী রইল না যে চার্চের দাবিগলো কত অযৌক্তিক।

চার্চের যাজক ও পোপের অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রথম শুরু হয় জার্মানিতে। জার্মানির সেই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতা ছিলেন মার্টিন লুথার। কিন্তু তার আগেও চার্চ তথা ধর্মযাজকদের নানাবিধ অন্যায়ের

বিরুদ্ধে ইংলন্ডের জন উইক্লিফ ও প্রাগের জন হাস্ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল যে চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে এবং যাজকরা সবসময় ধর্মকার্যেই ব্যস্ত থাকবেন। তবে এই সূত্রে জার্মানির উইটেনবার্গের মার্টিন লুথার যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা এক ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।



মার্টিন লুথার

মার্টিন লুথার নিজে একজন ধর্মযাজক ছিলেন। একজন সাধারণ কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি বিদ্যাভ্যাসের পরে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রোমে উপস্থিত হয়ে তিনি পোপের জাঁকজমক ও বিলাস-ব্যসন দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে এই-ভাবে বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকলে ধর্মকর্মের স্থান কোথায়? অর্থাৎ তিনি পোপ ও যাজকদের সৎজীবনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন। এমনি অবস্থায় টেড জেল নামক জনৈক যাজক জার্মানিতে মার্জনাপত্র বিক্রী করতে এলে মার্টিন লুথার তার বিরোধিতা করেন এবং এর প্রতিবাদে তার বক্তব্য চার্চের দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দেন।

লুথার তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে পোপ ও ধর্মযাজকদের নিজের ইচ্ছামত মার্জনাপত্র বিক্রী এবং বাইবেলের অনুশাসন ব্যাখ্যা করার কোন অধিকার নেই। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। মানুষ নিজের বিবেক ও বাইবেলের অনুশাসন অনুযায়ী ধর্মাচরণ করবে। লুথারের বক্তব্য পোপকে বিচলিত করে তোলে। তিনি ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে লুথারকে চার্চ থেকে বহিষ্কার করেন। লুথার এতে বিচলিত হননি, বরং তিনি পোপের সেই আদেশপত্র পুড়িয়ে দিলেন। এইভাবেই ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল বলা যেতে পারে।

প্রোটেস্টাণ্ট বা প্রতিবাদী ধর্মের প্রসার :

মার্টিন লুথার খ্রীষ্টান যাজক ও পোপের অনাচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। 'লুথারের' অনুগামীদের

সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এদিকে লুথারকে চার্চ থেকে বহিস্কৃত করবার ফলে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধর্মের সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবাদী ধর্মের লোকরা প্রথমে লুথারপন্থী নামে পরিচিত ছিল, কারণ লুথারের নেতৃত্বেই প্রথম প্রতিবাদী ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যে লুথারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকে সেই পন্থা অনুসরণ করে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। তখন সব সম্প্রদায়ের লোকেরা যারা খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠান চার্চের তথা পোপের কতকগুলি অন্যায় আচার-আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছিল তারা সকলেই 'প্রোটেস্টাণ্ট' বা 'প্রতিবাদী' নামে অভিহিত হয়। যারা পোপের অনুবর্তী থাকলো তারা 'রোম্যান ক্যাথলিক' নামে পরিচিত হয়।

জার্মানিতে সর্বপ্রথম পোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছিল বলে জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাদী ধর্ম প্রসার লাভ করে এবং সেটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে একথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে, জার্মানির সবগুলো প্রদেশেই লুথারের মতবাদ সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের জন ক্যালভিন। ক্যালভিন জাতিতে ফরাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ধর্মমতের জন্য তিনি ফ্রান্স ছেড়ে গিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করতে থাকেন। তিনি মৃত্যুর আগে প্রায় ২৫ বছর সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে থেকে ক্যালভিনপন্থাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। ক্যালভিন ব্যক্তিগত জীবনে সাধু, সরল ও কঠোর সংযমী ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে তিনি জেনেভাকে প্রকৃত 'ভগবানের শহর' হিসাবে গড়ে তুলবেন। ক্যালভিন যাজক সম্প্রদায়ের নিয়োগের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন।


ক্যালভিন

জেনেভা থেকে ক্যালভিন পন্থা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়েছিল। জেনেভায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণের জন্য আসতেন। সেখান থেকে স্বদেশে গিয়ে এই সব লোকেরা ঐ ধর্মমতকে জনপ্রিয় করে তুলতেন। এইভাবেই ক্যালভিনপন্থা ইউরোপে প্রসার লাভ করেছিল।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন ইংলণ্ডেও প্রসারলাভ করেছিল। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চার্চের নানাবিধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনেক দিন আগে থেকেই ইংরেজরা মানসিক দিক দিয়ে পোপের বিরুদ্ধে ছিল। সেই আমলে জন উইক্লিফ চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। তবে ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যালভিনপন্থা ইংলণ্ডে যখন প্রবেশ করে তখন থেকেই ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল বলা যেতে পারে।

ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর আমলেই ইংলণ্ডে প্রকৃত ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। অষ্টম হেনরী তাঁর মহিষী ক্যাথারিনকে পরিত্যাগ করবার অনুমতি চেয়ে পোপকে অনুরোধ করেন। কিন্তু পোপ সেই অনুমতি দিতে রাজী হননি। এর পরিণতিতে চার্চের সঙ্গে অষ্টম হেনরীর বিবাদ শুরু হল। বিবাদের ফলে অষ্টম হেনরী ইংলণ্ড থেকে পোপের আগাগোড়া কর্তৃত্বকে অস্বীকার করলেন। তিনি যাজকদের সব জমি বাজেয়াপ্ত করলেন এবং চার্চের অন্যান্য সম্পত্তি দখল করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে যে, অষ্টম হেনরী পোপের প্রাধান্য বিনষ্ট করলেও রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় মতবাদগুলির কোনো পরিবর্তন তিনি করেননি। পরবর্তীকালে অষ্টম হেনরীর কন্যা এলিজাবেথের আমলে ইংলণ্ডের চার্চের উপর পোপের কর্তৃত্বকে চিরদিনের জন্য নির্মূল করা হয়।



অষ্টম হেনরী

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফল সুদূরপ্রসারী ও বহুমুখী হয়েছিল। এই ধর্মান্দোলনের পরিণতি হিসাবে ইউরোপে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তা ছাড়া ক্যাথলিক ধর্মেরও পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল।

ক্যাথলিক চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ঃ

ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম ও তার প্রতিষ্ঠান চার্চের নানাবিধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয় তার প্রভাব ঐ ধর্মের মধ্যেও পড়েছিল বলা যেতে পারে। অবশ্য অনেকদিন আগে থেকেই ক্যাথলিকদের মধ্যে নানাবিধ পাপাচরণের বিরুদ্ধে অনেকে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল

যে চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত না করতে পারলে এবং যাজকদের উন্নত আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতে না পারলে চার্চের প্রতি আর কারো কোন আস্থা থাকবে না। ক্যাথলিক চার্চের এই আত্মশুদ্ধির আন্দোলন স্পেনেই প্রথম শুরু হয়েছিল এবং সেখান থেকে ইতালি ও অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। যাই হোক, ইগ্নেশিয়াস, লয়লা, লাইনেজ, জেভিয়ার প্রমুখের উদ্যোগে ইউরোপে প্রতি-সংস্কার আন্দালন শুরু হয়েছিল।

ক্যাথলিক ধর্ম ও ধর্মাধিষ্ঠানের আত্মশুদ্ধির আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল। থিয়েটাইন, বার্নবাইট প্রভৃতি সংঘ নানাভাবে যাজকদের উপর এই মর্মে নির্দেশ দিতে থাকে যে, তারা যেন শুদ্ধ জীবন-যাপন করেন এবং দারিদ্রের মত থেকে ধর্মকার্যে সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত থাকেন। এই প্রচারকার্য ও নির্দেশের ফলে ক্যাথলিক চার্চের যাজকদের মধ্যে কতক পরিবর্তন যে এসেছিল সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

প্রতি-সংস্কার আন্দোলনে 'ইনকুইজিশন কোর্ট' বা যাজকদের বিচারালয়ের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। স্পেনের ধর্মদ্রোহীদের বিচার করবার জন্য এবং শাস্তি দেবার জন্যই প্রধানত এই বিচারালয় স্থাপিত হয়েছিল। ক্রমে অবশ্য এই বিচারালয় খ্রীষ্টধর্মের নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল এবং প্রত্যেক ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানের সঙ্গে একটি করে বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিচারালয়-গুলো ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে বহু মানুষকে শাস্তি দিয়েছিল। বিচার করতে গিয়ে দোষী ব্যক্তিদের উপর অনেক সময় নির্মম শাস্তিও দেওয়া হত।

ইনকুইজিশন বিচারালয়ের মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বরং এই বিচারালয় যেভাবে মানুষের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল, তাতে ক্যাথলিক ধর্ম প্রষ্ঠানের প্রতি মানুষের ঘৃণা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

প্রতি সংস্কার আন্দোলন 'কাউন্সিল অব্ ট্রেন্ট' সভার দ্বারাও ত্বরান্বিত করা হয়েছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল লুথার-প্রচারিত প্রোটেস্টান্ট সমস্যার সমাধান করা এবং প্রতিবাদী আন্দোলনকে স্তিমিত করা। পঞ্চম চার্লস ছিলেন পবিত্র রোমান সম্রাট। তিনি ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে এ সভা আহ্বান করেছিলেন। এই সভার কাজ প্রায় ১৮ বছর ধরে চলেছিল। অনেকেই আশা করেছিলেন যে,

ট্রেন্ট-এর সভার মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্ম ও লুথারপন্থীর মধ্যে আপোস-মীমাংসা সম্ভব হবে। কিন্তু এই আশা পূরণ হয়নি। এই সভায় লুথার-পন্থীদের প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি দেখান হয়নি। এই সভায় পোপের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয় এবং লুথারবাদের বক্তব্যকে অস্বীকার করা হয়। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই লুথারবাদ ও ক্যাথলিকদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়নি।

প্রতি-সংস্কার আন্দোলন জেসুইট সংঘের কার্যকলাপে নিঃসন্দেহে যে শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইগ্নেশিয়াস লয়লা নামে জনৈক যাজক ছিলেন এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথম জীবনে একজন সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে তিনি চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে পড়েন। এই অবস্থাতেই তিনি খ্রীষ্টধর্মের একজন সেবক হিসাবে আত্মবিসর্জন দেন। ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল যাজকদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিয়মানুবর্তিতা ও দরিদ্রের জীবন-যাপন প্রভৃতি আদর্শে দীক্ষিত করা এবং তার মাধ্যমে যাজকদের আদর্শের প্রতি অনুগত করা। রাজনীতিতে যোগদান করা জেসুইট সংঘের আদর্শ-বহির্ভূত ছিল না। জেসুইট সংঘের অনেকেই তদানীন্তন রাজা বা রানীদের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করতেন।

প্রতি-সংস্কার আন্দোলনের ফলে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রসার অনেকখানি রুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, প্রতিবাদী আন্দোলনের উগ্রতা আগেকার তুলনায় অনেকখানি কমে গিয়েছিল। প্রতি-সংস্কার আন্দোলন ইউরোপে ধর্মসংক্রান্ত যুদ্ধের সূচনা ঘটিয়েছিল।

ধর্ম সংক্রান্ত যুদ্ধ : পঞ্চম চার্লস্‌-এর কার্যকলাপ :

পবিত্র রোমান সম্রাট ও স্পেনের অধিপতি পঞ্চম চার্লস্‌ রোমান ক্যাথলিক চার্চের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জার্মানি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে সেখানে প্রতিবাদী ধর্মের প্রসার তাঁকে বিচলিত করেছিল। স্বাভাবিক কারণেই জার্মানির কতকাংশে প্রতিবাদী লুথারপন্থার প্রসার ঘটায় পঞ্চম চার্লস্‌ সেই 'বিধর্মীদের' দমন করতে বদ্ধপরিকর হন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, চার্চের প্রতি আনুগত্য থাকলে তবেই পবিত্র রোমান সম্রাটের

প্রতি আনুগত্য থাকবে। নানা গোলযোগের পরেও শেষ পর্যন্ত প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ধর্মসংক্রান্ত যুদ্ধকে এড়ানো যায়নি।



পঞ্চম চার্লস

১৫৪৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মার্টিন লুথারের মৃত্যু হওয়ায় ধর্মসংক্রান্ত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতে আর বাধাও ছিল না। কারণ মার্টিন লুথার যতই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন না কেন তিনি ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পরে তাই প্রোটেস্টাণ্টরা ক্যাথলিকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হতে থাকে। ১৫৪৭ খ্রীস্টাব্দে ম্যালবার্গের যুদ্ধে ক্যাথলিকরা প্রোটেস্টাণ্টদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে পেরেছিল। তারপর আবার ১৫৪৮ খ্রীস্টাব্দে প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে একটা মোটামুটি সমঝোতায় আসবার জন্য আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। সেই আপস-আলোচনা ব্যর্থ হলে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। ১৫৫২ খ্রীস্টাব্দে প্যাসুর সন্ধি অনুসারে লুথারপন্থীদের প্রতি সহনশীলতার নীতি গৃহীত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত

১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত অগস্‌বার্গের সন্ধি অনুসারে লুথারপন্থীরা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে নিজেদের ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় ফিলিপ ঃ নেদারল্যান্ডসের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা লাভ ঃ

পঞ্চম চার্লসের আমলে সতেরোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত নেদারল্যাণ্ডস্‌ একতাবদ্ধ হয়েছিল। পঞ্চম চার্লস্‌ সেখানে তাঁর এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ফিলিপ যখন নেদারল্যাণ্ডসের ভারপ্রাপ্ত হন তখন সেখানকার প্রজাবর্গ তাঁর প্রতি অনুগত ছিল বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ফিলিপ ঐ প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন।

পঞ্চম চার্লস্‌ নেদারল্যাণ্ডে প্রতিবাদী ধর্ম প্রসারলাভ করছে দেখে নানা ধরনের দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ক্যাথলিক-বিরোধী ব্যক্তিদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হ'ত, তাঁদের গর্তে ফেলে দেওয়া হ'ত বা তরোয়ালের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা হ'ত। এইসব অত্যাচার সত্ত্বেও সেখানে প্রতিবাদী ধর্ম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং অধিকাংশ মানুষই ক্যাথলিক ধর্মবিরোধী হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় ফিলিপ শাসনকার্য গ্রহণ করবার পরে পুনরায় ঐ সব দমনমূলক নীতি কার্যকর করতে উদ্যোগী হওয়ার ফলে নেদারল্যাণ্ডবাসীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কেবল তাই নয়, ক্যাথলিক-বিরোধীদের ওপর অত্যাচার চালাবার জন্য সেখানে যাজকদের বিচারালয় বা 'ইনকুইজিশন' আদালতের সাহায্যও নেওয়া হতে থাকে।



দ্বিতীয় ফিলিপ

ফিলিপের আমলে ধর্মীয় কারণ ব্যতীত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণও নেদারল্যাণ্ডবাসীদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় ফিলিপ 'ইনকুইজিশন' বিচারালয়ের মাধ্যমে কেবল ক্যাথলিক-বিরোধীদেরই শায়েস্তা করেননি, তিনি তাঁর রাজনৈতিক শত্রুদেরও সেই বিচারালয়ের মাধ্যমে শাস্তি

দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। উপরন্তু দ্বিতীয় ফিলিপের অর্থনৈতিক নীতি নেদারল্যান্ডবাসীদের বিদ্রোহের দিকে ধাবিত করেছিল। দ্বিতীয় ফিলিপ নেদারল্যান্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নানাবিধ কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করবার ফলে নেদারল্যান্ডবাসীদের অর্থনৈতিক দুর্দশা চরমে উঠেছিল। দ্বিতীয় ফিলিপের উপরিউক্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল উইলিয়াম অব্ অরেঞ্জ নামক জনৈক অভিজাত ব্যক্তির নেতৃত্বে।

উইলিয়াম অব্ অরেঞ্জ-এর নেতৃত্বে নেদারল্যান্ডবাসীরা প্রথমে একটি মীমাংসাপত্র রচনা করে, যার মাধ্যমে তারা দেশ থেকে 'ইনকুইজিশন' বিচারালয় প্রত্যাহার ব্যতীত কতকগুলি সংস্কার প্রবর্তনের দাবি জানায়। দ্বিতীয় ফিলিপ কর্তৃক এইসব আবেদনের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় নেদারল্যান্ডবাসীরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এই ধরনের উত্তেজনার মুহূর্তে নেদারল্যান্ডের প্রতিবাদীরা ব্যাপক ক্যাথলিক-বিরোধী প্রচারকার্য শুরু করে এবং ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন মূর্তি ভাঙতে শুরু করে।

দ্বিতীয় ফিলিপ নানাভাবে অত্যাচারীদের মোকাবিলা করতে থাকেন। এক সময় উইলিয়াম অব্ অরেঞ্জ ফিলিপের কাছে তিনটি দাবি উত্থাপন করেছিলেন; যথা, সেনাবাহিনীকে অবিলম্বে নেদারল্যান্ড ত্যাগ করতে হবে; নেদারল্যান্ডে আগেকার শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত করতে হবে; এবং ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে নেদারল্যান্ডবাসীকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

ইতিমধ্যে নেদারল্যান্ডের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। উত্তরাঞ্চলের মানুষই ফিলিপের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ প্রধানত ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী হওয়ায় দ্বিতীয় ফিলিপ তাদের কাছ থেকে সমর্থন লাভ করেছিলেন বলা যেতে পারে। অবশেষে দেখা গেল ফিলিপের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল উত্তরাঞ্চলের মানুষই লিপ্ত হয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ নয়। দ্বিতীয় ফিলিপের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন সংগ্রাম চালিয়ে উত্তরাঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতা আদায় করতে পেরেছিল যার দরুন হল্যান্ড বা 'ডাচ' নামে তারা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় (১৫৮১ খ্রীঃ)। অবশ্য দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ আরও দীর্ঘদিন 'অস্ট্রিয়ান নেদাল্যান্ডস্' বা বেলজিয়াম নামে পরিচিত হয়ে স্পেনীয় রাজবংশের অধীনস্থ ছিল।

ইংলণ্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় ফিলিপের সংঘর্ষ :

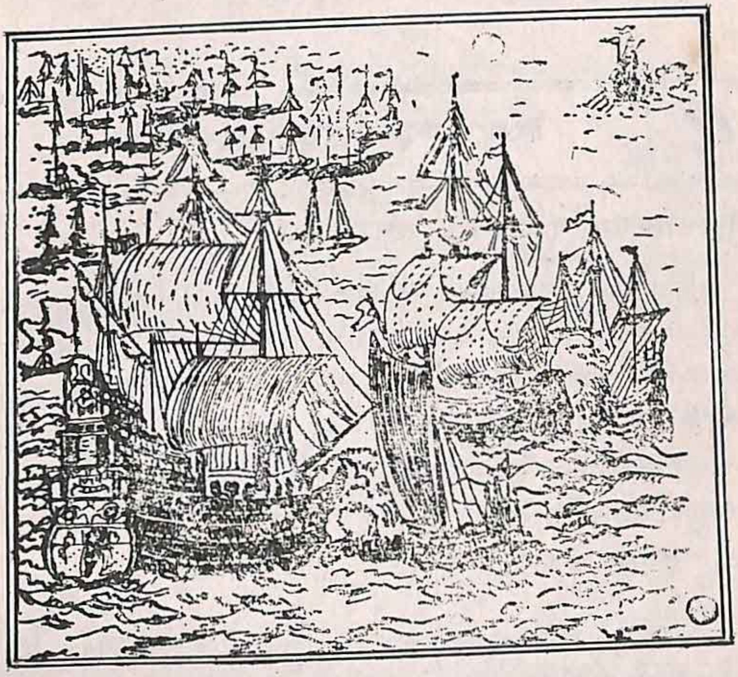
দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকালে প্রথম দিকে ইংলণ্ডের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল বলা যেতে পারে। কিন্তু রাণী মেরী টিউডরের পরবর্তী যে রাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন তাঁর আমলে দ্বিতীয় ফিলিপের সঙ্গে মনোমালিন্য শুরু হয়।

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ সাহসী ও কর্মতৎপর ছিলেন। দ্বিতীয় ফিলিপ এলিজাবেথকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্পেনের রাজার সহধর্মিনী হতে এলিজাবেথ চাননি। এরপর এলিজাবেথ যখন নিজেকে একজন প্রতিবাদী ধর্মের সমর্থক বলে ঘোষণা করেন এবং দ্বিতীয় ফিলিপের কার্যকলাপকে সমর্থন করা দূরে থাকুক তার প্রতিটি কাজের যখন বিরোধিতা করতে লাগলেন তখন স্পেন তাঁর প্রধান শত্রুতে পরিণত হয়। এলিজাবেথ স্পেনের সামুদ্রিক কার্যকলাপে বাধা দিতে শুরু করেন এবং নেদারল্যাণ্ডের ডাচ বিদ্রোহীদের সমর্থন জানাতে থাকেন। এমতাবস্থায় ফিলিপ এলিজাবেথকে সিংহাসনচ্যুত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। নানাভাবে এলিজাবেথকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ায় দ্বিতীয় ফিলিপ সামরিক শক্তির সাহায্যে তাঁকে সমুচিত শিক্ষা-দানের চেষ্টা করতে থাকেন।

ইংলণ্ডের সঙ্গে স্পেনের বিবাদের মূল কারণ ধর্মীয় শত্রুতা বলে অনেকে চিহ্নিত করেছেন। কারণ এলিজাবেথ ছিলেন প্রতিবাদী ধর্মীয় সমর্থক এবং স্পেনের ফিলিপ ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের। কিন্তু উভয় দেশের এই বিবাদে অর্থনৈতিক কারণও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বিভিন্ন দেশে স্পেন যে সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল এলিজাবেথের নির্দেশে ইংরেজ নাবিকরা তাতে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় ফিলিপ ক্রমশ উপলব্ধি করতে থাকেন যে, ইংলণ্ডকে যতদিন পর্যন্ত শায়েস্তা করা না যায়, ততদিন পর্যন্ত নব আবিষ্কৃত আমেরিকায় স্পেনীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহীদের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব হবে না। এই ধরনের মনোভাব থেকেই দ্বিতীয় ফিলিপ শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্পেনের বিখ্যাত রণতরী 'আর্মাডা' পাঠিয়েছিলেন।

সমসাময়িক ইউরোপে স্পেনীয় আর্মাডার শক্তি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। 'আর্মাডা' ১৩০ টি যুদ্ধ জাহাজ, ৮০০০ নাবিক এবং প্রায় ১৯,০০০ সৈন্য নিয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু ফিলিপ তাঁর প্রতিপক্ষকে ঠিকমত আন্দাজ করতে পারেননি।

ইংলণ্ডের দক্ষ নাবিকরা ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে আর্মাডাকে আক্রমণ করে



স্প্যানিস্ আর্মাডা

বিধ্বস্ত করতে পেরেছিলেন। আর্মাডার পতনের ফলে স্পেনের নৌশক্তি চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যায়।

---

৫ ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লবান্দোলন

ইংলন্ডরাজ বনাম পার্লামেন্ট ঃ দ্বন্দ্বের কারণ ঃ

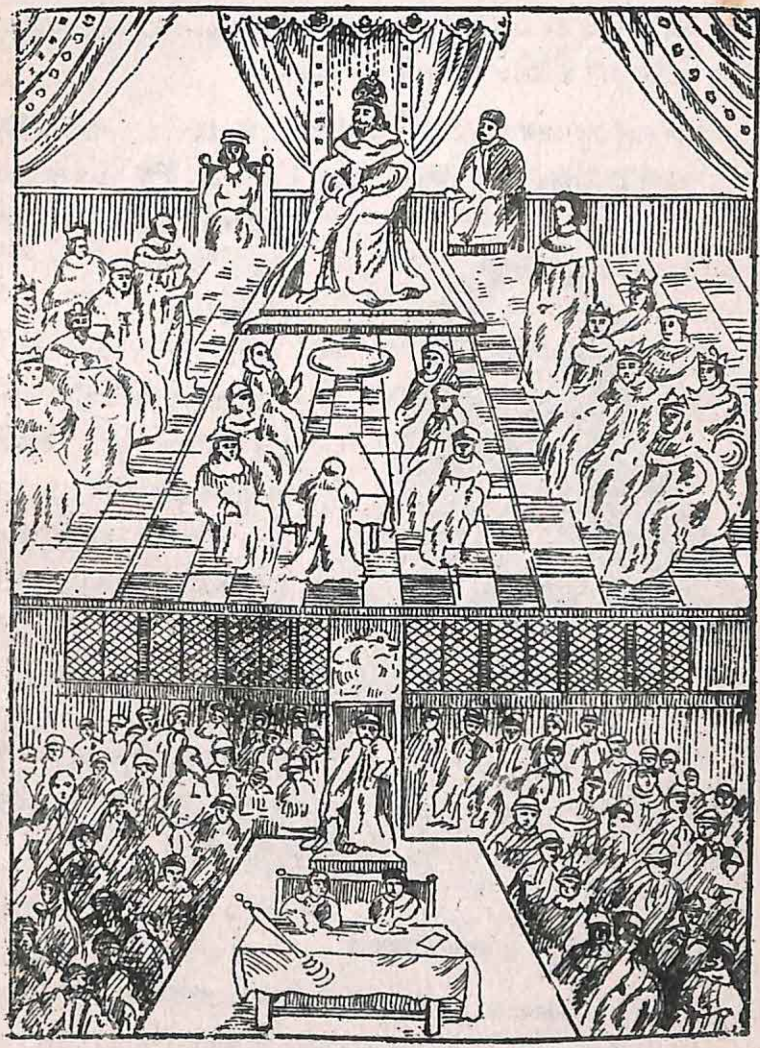
ইংলন্ডের ইতিহাসে টিউডর রাজত্বকাল (১৪৮৫-১৬০২) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়কালে ইংলন্ডের ইতিহাসে নানা পরিবর্তত ঘটেছিল। এই সময়ে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রভাবে এবং ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে ইংলন্ডের সর্বাঙ্গীণ জীবনে এসেছিল পরিবর্তন। এই নতুন ধারার প্রভাবে ইংলন্ডের সমাজজীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। ইংলন্ডে জন্মলাভ করেছিল নতুন ধনিক, ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এঁরা ইংলন্ডের পার্লামেন্ট সদস্য হিসাবে প্রবেশ করে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

ধনিক ব্যবসায়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রথম রাজনৈতিক বুদ্ধি ছিল। নানা বিষয়ে ব্যবসায়ী, ধনিক প্রভৃতির সঙ্গে পার্লামেন্টে রাজার মতবিরোধ দেখা দিলেও, টিউডর রাজারা জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন বলে সেই আমলে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ একটা চরম আকার ধারণ করেনি। কিন্তু টিউডরদের পরে যে স্টুয়ার্ট বংশ ইংলন্ডের সিংহাসনে আরোহণ করে তার রাজারা ছিলেন বিদেশী। এঁদের আমলে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের কলহ শুরু হয়।

স্টুয়ার্ট রাজারা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন। ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতাবলেই তাঁরা দেশ শাসন করছেন এইরকম তাঁদের ধারণা ছিল। রাজ্য-শাসনে প্রজাদের মতামত বা তাদের প্রতিনিধিদের পরামর্শ গ্রহণ করাকে তাঁরা অমর্যাদার কাজ বলে মনে করতেন। বলা বাহুল্য, এর দরুন পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে রাজার বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল।

ইংলন্ডরাজ প্রথম চার্লসের আমলে পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজার বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল। প্রথম চার্লস যুদ্ধের খরচসংকুলান ও শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে

প্রয়োজনীয় অর্থ পার্লামেণ্টের কাছ থেকে আদায় করতে পারেননি। অর্থাৎ সেই অর্থ কর বাবদ প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করবার ব্যাপারে কোন সমর্থন



ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের অধিবেশন

পার্লামেণ্টের সদস্যদের ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি নিজের ইচ্ছামত প্রজাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে থাকেন এবং ঋণ গ্রহণ করতে থাকেন। এইসব

কারণে পার্লামেণ্টের সদস্যরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেণ্টের অধিবেশনে সদস্যরা প্রথম চার্লসের কাছে এক আবেদনপত্র পেশ করেন যাতে তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা কোন ঋণ গ্রহণ বা কর চাপাতে পারেন না। তাঁরা আরো বলেছিলেন যে, রাজা বিনা বিচারে কাউকে আটক করে রাখতে পারেন না।

প্রথম চার্লসের অর্থের প্রয়োজন তখন ছিল খুবই বেশী। পার্লামেণ্টের সদস্যদের বিরোধিতার দরুন তিনি ১৬২৮ খ্রীঃ থেকে দীর্ঘ ১১ বছর কোন অধিবেশন আহবান না করে নিজের ইচ্ছামত কর ধার্য ও ঋণ গ্রহণ করতে থাকেন।



প্রথম চার্লস

পার্লামেণ্টের সঙ্গে রাজার বিরোধের অপর একটি কারণ হ'ল ধর্ম। স্টুয়ার্ট রাজারা ক্যাথলিক ধর্মানুরাগী ছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের মানুষ প্রতিবাদী ধর্মের লোক। সুতরাং তাদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে যে রাজা দেশে ক্যাথলিক ধর্ম চাপাতে চাইছেন। এই কারণে পার্লামেণ্টের পিউরিটান সদস্যরা চার্চের সংস্কার দাবি করে আসছিলেন। এইসব কারণে তখন চার্লসের সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ শুরু হয়।

গৃহযুদ্ধ : ক্রমওয়েল ও কমন্‌ওয়েলথ :

প্রথম চার্লস একজন ক্যাথলিক মহিলাকে বিবাহ করবার ফলে ইংলণ্ডের মানুষ তাঁর উপর আরো বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তা'ছাড়া অপরাপর যেসব বিষয় নিয়ে পার্লামেণ্টের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। যাই হোক, সপ্তদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে প্রথম চার্লস অর্থাভাবে পড়ে শেষ পর্যন্ত পার্লামেণ্ট আহবান করতে বাধ্য হন। এই পার্লামেণ্ট বারো বছর স্থায়ী হয়েছিল বলে তা "দীর্ঘ পার্লামেণ্ট" বলে খ্যাত (১৬৪০-৫১)। পার্লামেণ্টের

সদস্যরা এইবার তাঁর কাছে এক আবেদনপত্র উত্থাপন করে এবং তা মেনে নেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। রাজা বাধ্য হয়ে সেই আবেদনপত্র মেনে নিলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। ১৬৪২ সালে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় এবং তা দীর্ঘ ৭ বছর ধরে চলেছিল।

ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধে পার্লামেণ্টের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ওলিভার ক্রমওয়েল নামে জনৈক ব্যক্তি। তিনি 'আয়রণ সাইড' নামে এক সৈন্যদল গঠন করে রাজার বিরুদ্ধে লড়তে থাকেন। তিনি যুদ্ধে যে কৌশল গ্রহণ করেছিলেন তাতে শেষপর্যন্ত পার্লামেণ্ট জয়ী হয়েছিল। প্রথম চার্লস পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলে পরে তাঁর বিচার অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই বিচারে তাঁর শিরচ্ছেদের হুকুম হয়। ১৬৪৯ খ্রীঃ চার্লসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল এবং ইংলণ্ড একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।

চার্লসের মৃত্যুর পরে ইংলণ্ডে যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয় তাকে সাধারণতন্ত্র বলা যেতে পারে এবং তার নেতৃত্ব দেন ওলিভার ক্রমওয়েল। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ওলিভার ক্রমওয়েল 'রক্ষক' বা 'প্রোটেক্টর' পদ গ্রহণ করে শাসন পরিচালনা শুরু করেন ; ইংলণ্ডে এই শাসন 'কমনওয়েলথ' নামে পরিচিত। ক্রমওয়েল প্রায় ছয় বছর একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে দেশ শাসন করেছিলেন। তিনি ইচ্ছামত পার্লামেণ্ট আহ্বান করতেন আবার তা ভেঙ্গে দিতেন। অল্পকথায়, তিনি একজন স্টুয়ার্ট রাজা অপেক্ষাও বেশী স্বৈরাচারী ছিলেন। তবে বৈদেশিক যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হয়। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রিচার্ড ক্রমওয়েল 'রক্ষক' হন। এই সময়ে পার্লামেণ্টের সদস্যরা অতিষ্ঠ হয়ে প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে আবার সিংহাসনে স্থাপন করেন। এই ঘটনা 'রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা' নামে খ্যাত (১৬৬০ খ্রীঃ)।

গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮ খ্রীঃ) ঃ

দ্বিতীয় চার্লস নানা ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন। তাই প্রথম থেকেই তিনি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পার্লামেণ্টের সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে

সেজন্য পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজার বিরোধের কোন অবকাশ হয়নি। কিন্তু তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় জেমসের আমলে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ চরমে পেঁছেছিল।

দ্বিতীয় জেমস্ স্টুয়ার্ট রাজাদের স্বভাবসিদ্ধ ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন উদ্ধত প্রকৃতির এবং ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী। স্বভাবতই পার্লামেন্টের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধতে বেশী দেরী হল না। দ্বিতীয় জেমসের কোন সন্তান ছিল না। তাই সবাই ভেবেছিল যে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই বংশের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করায় সবাই প্রমাদ গুনল। পার্লামেন্ট ভাবতে লাগল যে এখন দ্বিতীয় জেমসের মৃত্যুর পরেও তাঁর স্বেচ্ছাচারী নীতি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় হিসাবে পার্লামেন্ট তখন দ্বিতীয় জেমসের জামাতা হল্যাণ্ডের উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জকে ইংলণ্ডের সিংহাসন গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম ও তার পত্নী মেরী ইংলণ্ডে উপস্থিত হলে দ্বিতীয় জেমস্ ফ্রান্সে পালিয়ে যান। এই ভাবেই ইংলণ্ডে বিনা রক্তপাতে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিপ্লব আবার 'গৌরবময় বিপ্লব' নামেও অভিহিত।

তৃতীয় উইলিয়ম রাজপদে আসীন হয়ে 'বিল অব্ রাইট্স্' নামে একটি সনদে স্বাক্ষর করেন। এই সনদের শর্ত অনুসারে তিনি পার্লামেন্টের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত কোনো আইন তিনি নাকচ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই গৌরবময় বিপ্লব একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ এই বিপ্লবের মাধ্যমে ইংলণ্ডের রাজার স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল। ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের রাজার উত্তরাধিকারী কে হবে তা নির্ধারণ করবার অধিকারও পার্লামেন্টের উপর বর্তেছিল।

(ক) মুঘল সাম্রাজ্য ঃ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঃ

ইউরোপে যখন নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন নানাভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তখন ভারতবর্ষে মুঘলরা এক পরাক্রান্ত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের স্থাপয়িতা ছিলেন মহম্মদ বাবর। বাবরের পিতৃকুলে পূর্বপুরুষ ছিলেন তুর্কী বীর তৈমুরলঙ্ এবং মাতৃকুলে পূর্বপুরুষ ছিলেন দুর্ধর্ষ চিঙ্গিজ খান।

নানা বিপর্যয়ের মধ্যে জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর মাত্র বাইশ বছর বয়সে কাবুল অধিকার করেন। কাবুলের অধিপতি হিসাবে তিনি যখন রাজত্ব করেছিলেন তখন দিল্লীর অভিজাত মুসলমানদের আমন্ত্রণে তিনি ভারতে উপস্থিত হন এবং পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে রাজত্ব শুরু করেন। তিনি স্বাভাবিকভাবেই কাবুল থেকে তাঁর রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল। এদের মধ্যে চিতোরের রানা সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাবরের রাজ্যসীমা কাবুল থেকে শুরু করে পাঞ্জাব, দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা প্রভৃতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাবর এদেশ জয় করলেও মৃত্যুর আগে তিনি এদেশের বিজিত অংশকে সুসংহত করতে পারেননি।



বাবর

১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর অধিপতি হয়েছিলেন। বাবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন ঠিক সেই সময় বাংলা ও বিহার অঞ্চলে শের শাহ সুর নামে জনৈক জায়গীরদার পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছেন। হুমায়ুন তাঁর কাছে বক্সারের সন্নিকটে চৌসার যুদ্ধে পরাজিত

হয়েছিলেন (১৫৩৯ খ্রীঃ)। পরের বছর তিনি আবার বিলগ্রামের যুদ্ধে তাঁর কাছে পরাজিত হন। এই সময় হুমায়ুন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে পারস্যে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পারস্যের দিকে তিনি যখন যাত্রা করেছেন তখন পথিমধ্যে পত্নী হামিদা বেগমের গর্ভে পুত্র আকবরের জন্ম হয়।

শের শাহের রাজত্ব :

বাবর ভারতবর্ষে যে মুঘল রাজত্বকালের সূচনা করেছিলেন, মাঝখানে পাঁচ ছয় বছর তাতে ছেদ পড়েছিল। হুমায়ুন পরবর্তীকালে আবার তাঁকে পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে স্বল্প রাজত্বকালে শের শাহ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ভারতের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শের শাহ হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করে এদেশে আফগান-জাতীয় শূরবংশীয় শাসনের সূচনা করেছিলেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্য ছিল অসাধারণ এবং এই শক্তির দ্বারাই তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে পেরেছিলেন। পরে শাসক হিসাবে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন তা সর্বকালের সর্বজনের কাছে নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়। শের শাহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রজাদের মঙ্গল সাধন করতে না পারলে রাজত্ব বেশীদিন চালানো সম্ভব নয়। একজন খাঁটি মুসলমান হলেও তিনি শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজেকে ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে তুলে নিয়েছিলেন। ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামি ত্যাগ করে তিনি জনকল্যাণমূলক শাসন প্রবর্তন করে প্রজাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে শের শাহ কতকগুলি স্থায়ী নীতি নির্ধারণ করেছিলেন যার দরুন প্রজারা যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতির সাহায্যে তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম করে তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শের শাহ প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থার মৌলিক নীতিগুলো পরবর্তী-কালের কৃতী সম্রাটরা গ্রহণ করেছিলেন।

হুমায়ুন কর্তৃক মুঘল রাজ্যের পুনরুদ্ধার : আকবর :

শের শাহের জীবদ্দশায় হুমায়ুন এদেশে মুঘল রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কিন্তু শের শাহের বংশধরেরা তেমন সুযোগ্য ছিলেন না। এর পরিণতি হিসাবে তাঁদের আমলে হুমায়ুন পারস্য থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দিল্লীর মসনদে আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন সরহিন্দের যুদ্ধে সিকন্দার সুরকে পরাজিত করে

দিল্লী অধিকার করেন। তবে তিনি দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করতে পারেননি। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

হুমায়ুনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র বর্তমান পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর অঞ্চলে অবস্থিত কালানৌর দুর্গে আকবরের রাজ্যাভিষেক হয়। সেই সময় হুমায়ুনের জনৈক বন্ধু বৈরাম খান আকবরের অভিভাবক ছিলেন। আকবরের সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তাঁকে লিপ্ত হতে হয়েছিল। আদিল শাহের



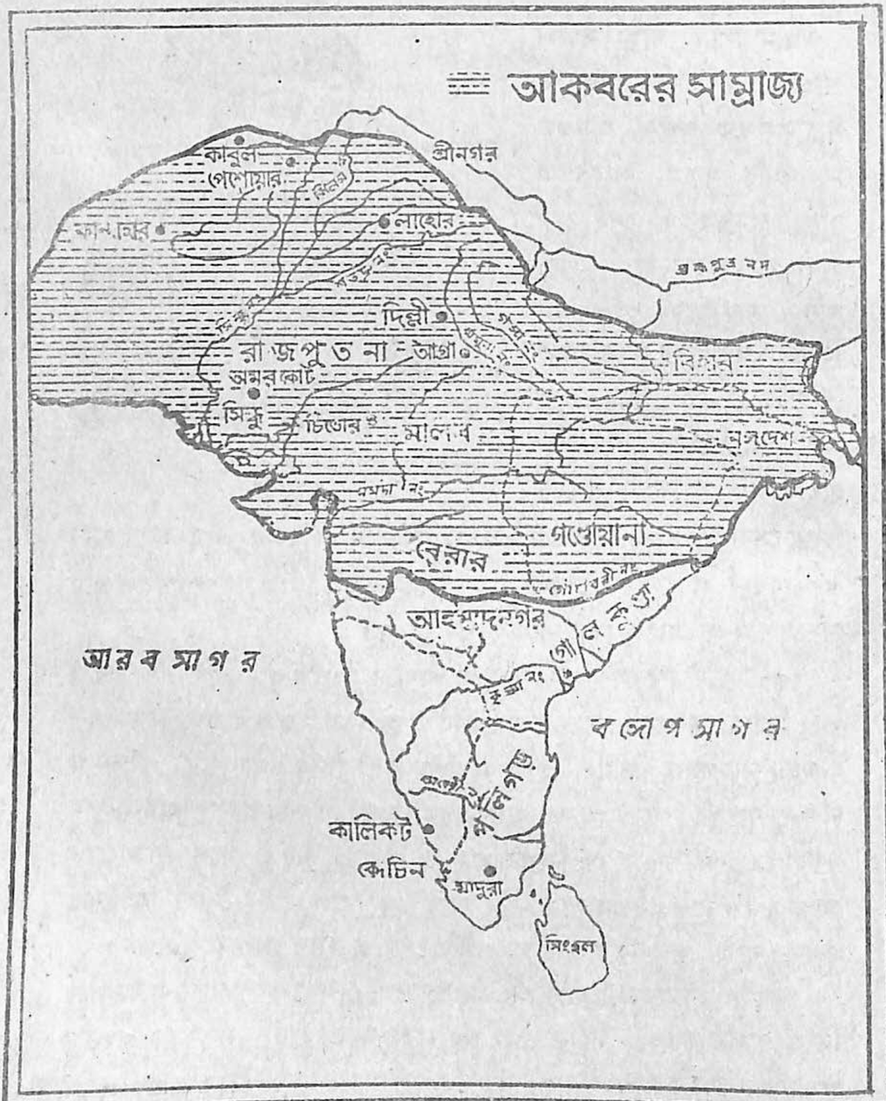
আকবর

হিন্দু সেনাপতি হিমু ইতিমধ্যে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে নিয়েছেন। এমতাবস্থায় পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রীঃ) হিমুকে পরাজিত করে বৈরাম খান আকবরকে সিংহাসনে স্থাপন করেন।

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর নিজ হস্তে শাসনভার গ্রহণ করে রাজ্যজয়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি একে একে ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে মুঘল রাজ্যকে সাম্রাজ্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। তিনি উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ জয় করেছিলেন। রাজ্য বিস্তার করতে গিয়েআকবর সর্বদা যে রণনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন তা মোটেই নয়। বরঞ্চ প্রতিপক্ষের আত্মসমর্পণ লাভ করবার পরে তিনি তাকে বন্ধু বলে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। আকবর রাজপুতদের প্রতি শেষোক্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

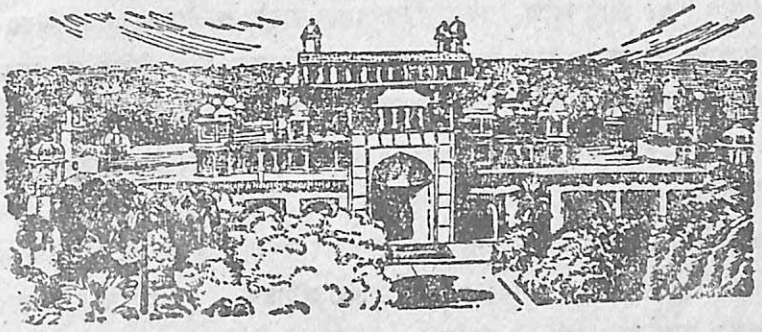
আকবর বিজেতা হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন, কিন্তু একজন শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন মহান। তিনি রাজ্য জয় করেই ক্ষান্ত হননি, সুশাসন প্রবর্তন করে রাজ্য রক্ষা করতেও আগ্রহী ছিলেন। সুশাসনের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে শাসনব্যবস্থা পরিদর্শন করতেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতেন। বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি সমতানীতি মেনে চলতেন। আকবর ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলেও কোন প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি সব ধর্মমতের সারাংশ নিয়ে নতুন ধর্ম 'দীন-ই-ইলাহী' প্রবর্তন করেছিলেন।

আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র সেলিম 'জাহাঙ্গীর' উপাধি গ্রহণ ক'রে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রাণা প্রতাপের



পুত্র অমর সিংহ মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এই রাজত্বকালেই আবার কান্দাহার মুঘল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি। তিনি

আরামপ্রিয় সম্রাট ছিলেন। তিনি তাঁর পত্নী নূরজাহানের উপর শাসনভারের



আকবরের সমাধি

দায়িত্ব অর্পণ করেন। জাহাঙ্গীর প্রজাবৎসল ছিলেন। অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র শাহজাহান মুঘল সম্রাট হন। শাহজাহান কান্দাহারকে মুঘল শাসনভুক্ত করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি আবার মুঘল সম্রাটের আনুগত্যাধীন হয়। শাহজাহান অকারণে রক্তপাতের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর রাজত্বকাল সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য প্রসিদ্ধলাভ করেছে।

আওরঙ্গজেব ও মুঘলশাসনের অবনতি ঃ

শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব ছিলেন মুঘলদের মধ্যে শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট। শাহজাহানের জীবদ্দশাতেই তাঁর চার পুত্র দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ সিংহাসনাধিকার নিয়ে বিবাদ শুরু করেছিলেন। এই ভ্রাতৃ-বিরোধে অন্যান্য ভ্রাতাদের বিতাড়িত ও হত্যা করে আওরঙ্গ-জেব বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে কারারুদ্ধ করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে বসেন।



আওরঙ্গজেব

আওরঙ্গজেব মনের সংকীর্ণতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। তিনি কাউকে যেমন বিশ্বাস করতেন না, তেমনি অমুসলমান ব্যক্তিদের প্রতি তিনি উদার মনোভাব গ্রহণ করেননি। তাঁর এই ভ্রান্ত নীতির ফলে

মুঘল সাম্রাজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আওরঙ্গজেব তাঁর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর রাজত্বকাল কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ করেই কাটিয়েছিলেন। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং দক্ষিণ-ভারতে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দমন করতে আওরঙ্গজেবকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল।

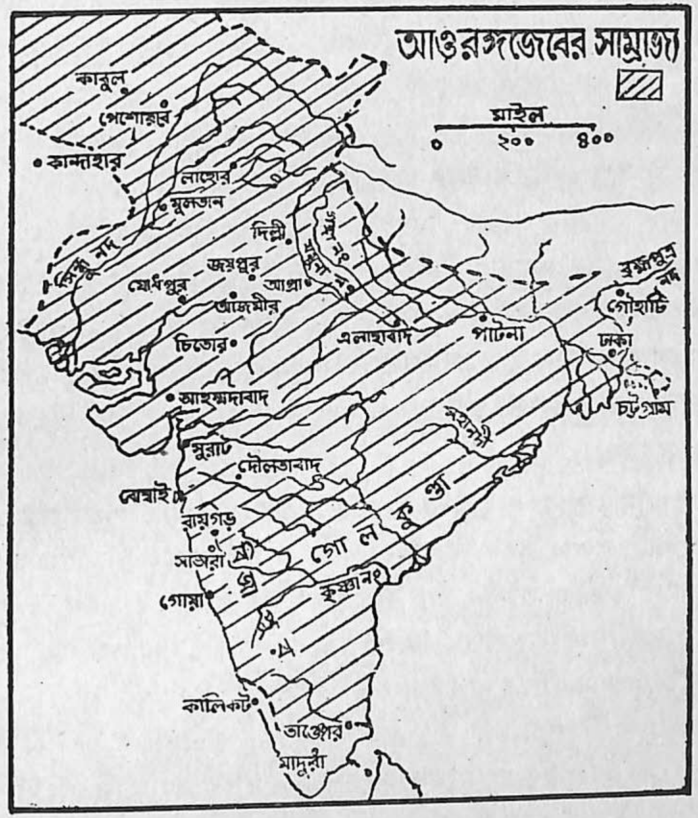
আওরংগজেবের অনুদার নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। মারাঠা, রাজপুত, জাঠ, সৎনামী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ একে একে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে কেন্দ্রীভুত শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্য কেবল আঘাত প্রাপ্তই হয়নি, দ্রুত তা পতনের দিকে ধাবিত হয়েছিল। এর পরিণতি হিসাবে লক্ষ্য করা যায় যে, আওরংগজেবের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই মুঘল সাম্রাজ্যের আর কোন অস্তিত্বই ছিল না। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরংগজেবের মৃত্যু হয়েছিল।

মুঘল শাসন-ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ মুঘল শাসন-ব্যবস্থার যে ভিত্তি মহামতি আকবর স্থাপন করেছিলেন, দীর্ঘ মুঘল শাসনে তার মূল কাঠামো অপরিবর্তিত ছিল বলা যেতে পারে। মুঘল বাদশাহ বেশ কয়েকজন দক্ষ কর্মচারীর সাহায্যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। মুঘল রাজস্ব-ব্যবস্থাও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। নগদ অর্থ বা শস্যের দ্বারা করবাবদ পাওনা টাকা মিটিয়ে দেওয়া চলতো। মুঘল শাসকরা স্বেচ্ছাচারী হলেও সর্বক্ষেত্রে যে স্বৈরাচারী নীতি অনুসরণ করতেন তা বলা যায় না।

মুঘল আমলে ভারতবর্ষীয় সমাজ মোটামুটিভাবে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল বলা যেতে পারে ; যেমন, অভিজাত সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষ। অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ বিলাস-ব্যসনে নিমগ্ন থাকতেন ; অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অধিকাংশই ছিল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ। তারা অতি কষ্টে নিজেদের জীবিকা অর্জন করত। বিদেশী পর্যটকদের সকলেই মুঘল অভিজাতদের ঐশ্বর্য ও বিলাসের প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। মুঘল আমলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলতে ব্যবসায়ী, পণ্ডিত, পুরোহিত শিল্পী প্রভৃতিকে বোঝাত। এই সম্প্রদায় আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল হলেও তাঁরা প্রাচুর্যের মধ্যে থাকতেন না।

মুঘল আমলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক। আওরঙ্গজেব প্রমুখ কয়েকজনের অনুদার নীতি সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, অধিকাংশ মুঘল সম্রাটই ধর্মীয় উদারনীতি

অবলম্বন করায় হিন্দু-মুসলিম মিলনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অবাধে মেলামেশা, বিবাহ প্রভৃতির ফলে উভয় ধর্মই পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল। হিন্দুরা ফারসী ভাষা আয়ত্ত করে সম্রাটের দরবারে চাকরী নিতেন, আবার মুসলমানরা হিন্দু-সাহিত্য সৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখাতেন।



মুঘল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা জানতে হলে বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনার উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। সেই আমলে জিনিসপত্রের দাম ছিল খুবই সস্তা। চাল, ডাল, তরিতরকারী সুলভে পাওয়া যেত। বিদেশী পর্যটকদের প্রায় সকলেই দামের স্বল্পতার কথা উল্লেখ করেছেন। একথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, জিনিষপত্রের মূল্য যেমন কম ছিল সাধারণ মানুষের আয়ের অনুপাতও বর্তমানের চেয়ে অনেক কম ছিল। সেই কারণে দেশের সাধারণ

মানুষ যে স্বচ্ছল জীবন-যাপন করত একথা মোটেই বলা যায় না। উপরন্তু কৃষি ব্যবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটবার ফলে দেশে দুর্ভিক্ষের ঘটনা প্রায়শঃই লেগে থাকত।

মুঘল যুগে একাধিক শহর গড়ে উঠেছিল। এইসব শহরের মধ্যে আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি প্রধান। ইউরোপের শিল্প-নগরীর মত এইসব নগরী শিল্প-নগরী হিসাবে গড়ে উঠলেও সেই আমলে শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত খ্যাতিলাভ করেছিল। বাংলার রেশম ও তুলাজাত দ্রব্য, কাশ্মীরের পশমী বস্ত্র আজকালকার মত সেই আমলেও ভারতের গৌরবের বিষয় ছিল। ভারতীয় বন্দর যেমন সুরাট, ব্রোচ, বেসিন প্রভৃতি থেকে রপ্তানী সামগ্রী জাহাজ-যোগে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চালান যেত।

মুঘল সম্রাটরা শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুঘল যুগের সভ্যতার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু-মুসলমান রীতি ও ভাবধারার অপূর্ব মিলন ও সংমিশ্রণ। সাহিত্য, ধর্ম, শিল্প, চিত্রকলা সব ব্যাপারেই এই সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের সূচনা হয়েছিল সুলতানী যুগে এবং মুঘল আমলে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

প্রাচীন ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির সংগে পারসিক প্রভাব মিশ্রিত হয়ে জন্মলাভ করেছিল আধুনিক হিন্দুস্থানী সংগীত। মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে যাঁরা সঙ্গীত-চর্চায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তানসেন ও রাজবাহাদুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুঘল যুগের চিত্রকলার মধ্যেও হিন্দু-মুসলমান রীতির সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয় ও পারসিক শিল্পরীতির সংমিশ্রণে জন্মলাভ করেছিল মুঘল চিত্রকলা। হুমায়ুনের দরবারে দুজন প্রসিদ্ধ শিল্পীর নাম মীর সৈয়দ আলি এবং আবদুস সামাদ। মুঘলযুগে রাজপুতানা ও কাংড়া অঞ্চলে সম্পূর্ণভাবে বিদেশী প্রভাবমুক্ত চিত্রাঙ্কনরীতিও প্রচলিত হয়।

মুঘল আমলে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। শিল্পের এই শাখায় ভারতবর্ষ এই আমলে যে সুনাম অর্জন করেছিল ভারতের ইতিহাসে আর কোন সময়েই তা সম্ভব হয়নি। স্থাপত্যশিল্পের প্রতি আকবরের অনুরাগ ছিল। 'আগ্রার কেল্লা' ও 'ফতেপুর সিক্রী' আকবরের রাজত্বের দুটি স্মরণীয় কীর্তি। তবে শাহজাহানের আমলকে মুঘল স্থাপত্যশিল্পের চরম

উন্নতির যুগ বলা যেতে পারে। শ্বেত পাথরের ব্যবহার ও প্রাসাদগাত্রে সোনা-রূপা ও মূল্যবান পাথরের ব্যবহার সেই আমলের শিল্পরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। মোতি মসজিদ, দেওয়ান-ই খাস, দেওয়ান-ই আম প্রভৃতি শাহজাহানের রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। যমুনার তীরে শ্বেতপাথরে নির্মিত পত্নী মমতাজ মহলের সমাধি 'তাজমহল' শাহজাহানের অমর কীর্তি হিসাবে বিবেচিত।

মুঘল আমলে শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও প্রভুত উন্নতি হয়েছিল। এ ব্যাপারে প্রত্যেক মুঘল বাদশাহই কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। বাবর তুর্কী ভাষায় এবং জাহাঙ্গীর পারসিক ভাষায় তাঁদের আত্মচরিত লিখে গিয়েছেন। আকবরের আমলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন বীরবল। আকবরের উৎসাহে সংস্কৃত থেকে অনেক ধর্মগ্রন্থের পারসিক ও উর্দু ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সেই আমলে হিন্দী ভাষায় সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন তুলসীদাস।

মুঘল আমলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতির উন্নতির কথা বিশেষ ভাবে জানা যায় বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকে। সেই আমলে যেসব বিদেশী পর্যটক এদেশে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে হকিন্স, টমাস রো, বার্ণিয়ে, টেভার্নিয়ে, বার্টন কার্টরাইট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রত্যেকেই প্রায় সেই আমলের কোন-না কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশংসা করে গিয়েছিলেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঃ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন দ্রুততর হয়ে ওঠে। আওরঙ্গজেবের ক্ষমতালাভের সময়ই মুঘল সাম্রাজ্যের সামাজিক রাজনৈতিক অনৈক্যের শক্তিগুলি এবং প্রতিষ্ঠানগত ভাঙ্গন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে এই ভাঙ্গন সম্পূর্ণ রোধ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই কথা স্বীকার করতেই হবে, যে দূরদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক গুণপতনের এই ধারাগুলিকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য অবরুদ্ধ করতে পারত তা আওরঙ্গজেবের ছিল না। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য ও মারাঠা-নীতি এক অনর্থক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে মুঘল শক্তিকে জড়িয়ে ফেলে। রাজপুতদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সম্পর্কেও ফাটল ধরে। মারাঠাদের উত্থানের প্রকৃত চরিত্র আওরঙ্গজেব অনুধাবন করতে পারেননি। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং মারাঠা আক্রমণে দাক্ষিণাত্য অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। সামগ্রিকভাবে মুঘল অর্থনীতি অনুৎপাদক যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। আওরঙ্গজেবের এই রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও উত্তর ভারতে মুঘলশাসন তখনও শক্তিশালী ছিল এবং জনসাধারণের কল্পনায় মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিও ছিল দৃঢ়)। আওরঙ্গজেবের

ধর্মীয় নীতি মুঘল রাজশক্তিকে শুধু হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল তাই নয়, উপরন্তু রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে যে সব শক্তিগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ছিল তাদের হাতও শক্তিশালী করে তোলে।

ব্যক্তিগতভাবে আওরঙ্গজেব দক্ষ শাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রে ছিল কিছু দোষ ত্রুটি, যেমন কারুর ওপর তিনি আস্থা রাখতেন না এবং সন্দিগ্ধ চিত্ততা সম্রাটের ব্যক্তিগত দায়িত্বের গুরুত্বকে আরও বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের পরবর্তীকালের সম্রাটদের মধ্যে এই ব্যক্তিগত যোগ্যতার অভাব ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। একের পর এক দুর্বল সম্রাটের শাসন মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের শিথিল অবস্থাকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের এই দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বৈদেশিক আক্রমণের ঢেউ। বস্তুতঃ ভারতে পূর্ববর্তী সমস্ত সাম্রাজ্যের পতনের পিছনে যে কারণটি অনিবার্যভাবে কাজ করেছিল তা হ'লো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বৈদেশিক আক্রমণ। মুঘল শাসনের ক্রমাবনতির পর্যায়ে এই বৈদেশিক আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তির উপর আঘাত হানে।

মুঘল শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ ছিল অভিজাত সম্প্রদায়। আওরঙ্গজেবের পরবর্তীকালের দুর্বলচেতা সম্রাটদের শাসনকালে এই অভিজাত সম্প্রদায় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুঘল রাজদরবারে অনবরত চ'লতে থাকে অভিজাত সম্প্রদায়ের চক্রান্ত। যেহেতু মুঘল শাসনব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভুত, স্বভাবতই প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত যোগ্য সম্রাটের। সম্রাটরা অযোগ্য হওয়ায় ওমরাহরাও চেষ্টা ক'রেছিলেন এই অভাব পূরণের, কিন্তু তাঁরাও ব্যর্থ, ব্যক্তিগত অসাফল্য এবং প্রতিষ্ঠানগত পতন একই সঙ্গে যুক্ত হল।

কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতায় যে রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দিয়েছিল তার ফলে বিভিন্ন প্রান্তে মুঘল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মারাঠারা আগেই শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হ'লো জাঠ, আফগান, শিখ এবং দাক্ষিণাত্যে আঞ্চলিক শক্তি বিকাশের প্রচেষ্টা। সুবা বাংলায় মুর্শিদকুলি খাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রায় স্বাধীন আঞ্চলিক নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। ইংরেজরা এদেশে আগেই ব্যবসা ক'রতে এসেছিল। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে রাজনৈতিক শক্তিকে প্রতিষ্ঠার প্রথম সুযোগ পেল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লাকে পরাস্ত করে।

(খ) ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ঃ

পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের সঙ্গে সরাসরি জলপথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। কিন্তু তখন কালিকটে আরব বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ প্রভাববিস্তার করেছিল। তাদের সঙ্গে পর্তুগীজদের বিবাদ শুরু হয় এবং কালিকটের শাসক জামোরিনও পর্তুগীজদের বিরোধিতা শুরু করেন।

ভারতে প্রকৃত পর্তুগীজ ক্ষমতা বিস্তার যিনি করান তাঁর নাম আলফানসো দ্য আলবুকার্ক। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে পর্তুগীজদের গভর্ণররূপে আসেন। তিনি ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে গোয়া অধিকার করেন। আলবুকার্ক মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিলেন। তিনি পর্তুগীজদের এক শক্তিশালী নৌ শক্তিতে পরিণত করেন। গোয়া, দমন, দিউ, সলসেটি, বেসিন, বোম্বাই, মাদ্রাজ, অঞ্চলে সান থোম, বাংলাদেশে হুগলী অঞ্চল পর্তুগীজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল।



আলবুকার্ক

পর্তুগীজদের ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের ঈর্ষান্বিত করে তোলে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য অনুমতি পেয়েছিল। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজরা ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করল। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের নেতা কোলবার্ট ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেন। এই কোম্পানী পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জার্মানী অসটেণ্ড কোম্পানী এবং সুইডেন সুইডিস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেছিল।

কালক্রমে দেখা যায় যে, এই সমস্ত বিদেশী বণিকদল ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে। কালক্রমে বিদেশী বণিকদের এদেশে রাজ্যস্থাপনের বাসনা দেখা যায়। একদল অপর দলকে

বিতাড়িত করবার চেষ্টা শুরু করে। এই সমস্ত বিদেশী বণিকের দল অনেক সময় দেশীয় বণিকদের উপর জুলুম করতো। যেমন ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী বণিক মিডলটন সুরাটের বণিকদের কাছ থেকে জোর করে ক্ষতিপূরণ আদায় করেছিলেন। সেকালে সমুদ্রের উপর সুলতান বা সম্রাটদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল থাকায় বিদেশী বণিকদল দেশীয় বণিকদের উপর অত্যাচার করবার সুযোগ পেয়েছিল। ইতিমধ্যে এই সমস্ত বিদেশী বণিকদের ভাগ্যাকাশে পরিবর্তন দেখা যায়। পর্তুগীজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাস পায়। অবশেষে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এক প্রবল আকার ধারণ করে। কখনও কখনও ইংরেজরা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ওলন্দাজদের সংগে জোট বাঁধে, আবার কখনও কখনও ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ওলন্দাজের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছিল। শেষপর্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ হয় এবং ফ্রান্সকে শেষপর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

ভারতের বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতা ইংরেজদের ব্যবসার কেন্দ্রস্থল ছিল; অপর পক্ষে ফরাসীদের পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, মাহে, কারিকল প্রভৃতি অঞ্চল ব্যবসার কেন্দ্রস্থল ছিল। ফ্রান্স অপেক্ষা ইংলণ্ডের সম্পদ অনেক বেশী ছিল। তাদের কার্যকলাপে সরকারী হস্তক্ষেপ কম ছিল। কিন্তু ফরাসী কোম্পানির ওপর সরকারের কর্তৃত্ব ছিল বেশী যাই হোক, পণ্ডিচেরীতে ফরাসীদের গভর্নর হয়ে আসেন ডুপ্লে। ভারতবর্ষে তিনি ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। খুব


ডুপ্লে

স্বাভাবিক কারণেই ইংরেজদের সংগে ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। ইংরেজদের প্রধান কর্ণধার ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে এই সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থল ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক অঞ্চল। কর্ণাটকের নবাব ছিলেন আনোয়ারউদ্দীন। পর পর তিনবার ফরাসীদের সংগে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়—প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ, দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ এবং তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ। প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধে ডুপ্লে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন

করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি পরাজিত হন এবং স্বদেশে ফিরে যান। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে রবার্ট ক্লাইভ ফরাসীদের পরাজয়ের জন্য বিশেষভাবে কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি শুধুমাত্র কর্ণাটকে নয়, পূর্ব ভারতে বাংলাদেশেও আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি বাংলাদেশে সিরাজদৌল্লাকে (১৭৫৭ খ্রীঃ ২২শে জুন) পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করেন। সিরাজের পতনের পর বাংলাদেশে ইংরেজরা প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হ'লে ভারতবর্ষে ফরাসীদের সাম্রাজ্য স্থাপনের বাসনা চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

মারাঠাদের ক্ষমতা বিস্তার ঃ মারাঠা শক্তির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শিবাজী। শিবাজী আওরঙ্গজেবের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শম্ভুজী মারাঠাদের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। শম্ভুজীর শিশু পুত্র সাহু ও রাজারামকে আওরঙ্গজেব দিল্লীতে নিয়ে আসেন এবং বন্দী করে রাখেন। রাজারাম পলায়ন করেন এবং জিঞ্জিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আওরঙ্গজেব জিঞ্জি অবরোধ করেন, এবং দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলার পর তা অধিকার করেন। আওরঙ্গজেব জীবিতকাল পর্যন্ত মারাঠাদের সংগে যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু তাদের সম্পূর্ণরূপে দমন করতে ব্যর্থ হন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হয়। তাঁর বিধবা পত্নী তারাবাঈ তাঁর শিশু পুত্র শিবাজীর (তৃতীয়) অভিভাবকরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মারাঠারা বেরার, মালব, গুজরাট, বরোদা প্রভৃতি রাজ্যে ক্ষমতা বিস্তার করতে শুরু করে। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরংগজেব মারা যান।



শিবাজী

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ সম্রাট হন। তাঁর অন্যতম পরামর্শদাতা জুলফিকার আলি সাহুকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিতে সম্রাটকে অনুরোধ করেন। সাহু ছাড়া পেয়ে মহারাষ্ট্রে ফিরলে তারাবাঈয়ের সঙ্গে তাঁর গৃহযুদ্ধ

শুরু হয়। দীর্ঘকাল এই গৃহযুদ্ধ চলেছিল। অবশেষে সাহু জয়লাভ করেন এবং এই জয়লাভের জন্য সাহুকে যিনি বিশেষভাবে সাহায্য করেন তাঁর নাম বালাজী বিশ্বনাথ। সাহু ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথকে পেশোয়া (প্রধানমন্ত্রী) পদে নিযুক্ত করেন। এরপর দেখা যায় পেশোয়া প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠেন এবং ছত্রপতি অর্থাৎ মারাঠা রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর ফারুখ-শিয়ার সম্রাট হন। তাঁর শাসনকালে আবদুল্লা ও হুসেন আলী নামে দুজন অভিজাত শ্রেণীর কর্মচারী দিল্লীতে শক্তিশালী হয়ে উঠেন। ফারুখশিয়ার হুসেন আলীকে জব্দ করবার জন্য মহারাষ্ট্রে পাঠান। সাহু ও হুসেন আলীর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সাহু ফারুখশিয়ারকে দিল্লীর সম্রাটরূপে মেনে নেন এবং মারাঠারা দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার লাভ করে। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়া পদ গ্রহণ করেন।



বাহাদুর শাহ

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর স্বাধীন হিন্দু রাজ্য গঠন করা বাজীরাওয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সমস্ত হিন্দু রাজাদের সমর্থন পাবার জন্য তিনি হিন্দু রাজ্য গঠনের আদর্শ গ্রহণ করেন। যখন তিনি মালব রাজ্য আক্রমণ করেন তখন সমস্ত হিন্দু রাজারা তাঁকে সাহায্য করেছিল। গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে তিনি গুজরাট অধিকার করেন। ইতিমধ্যে দিল্লীর সম্রাট বাজীরাওয়ের ক্রমাগত রাজ্যজয়ে শঙ্কিত হয়ে নিজাম-উল-মুলককে তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ভূপালের যুদ্ধে নিজাম পরাজিত হন। এর ফলে মুঘলরা মালবে মারাঠা অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হয়। বাজীরাও সলসেটি ও বেসিন অঞ্চল থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করেন।

বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বালাজী বাজীরাও ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়াপদে নিযুক্ত হন। বালাজী বাজীরাও তাঁর পিতার হিন্দুরাজ্য গঠনের

আদর্শ পরিত্যাগ করেন। তিনি এরজন্য রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দু রাজাদের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হন। তিনি নিজামের বিরুদ্ধে উদগীরের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ইতিমধ্যে এক বিরাট বিপদ ভারতবর্ষ এবং মারাঠা সাম্রাজ্যে দেখা দেয়। নাদির শাহ পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অতি সহজেই পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রবেশ করেন। দুই মারাঠা নেতা মহাদাজী সিন্ধিয়া এবং টুকাজী হোলকর তাঁকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হ'ন। অবশেষে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা সেনাবাহিনী পাণিপথের প্রান্তরে আফগানদের বিরুদ্ধে মিলিত হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ' নামে পরিচিত। বালাজী বাজীরাও পরাজিত হন এবং ইহার অল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। একথা সত্য যে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠারা প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মারাঠা শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়নি। অল্পকাল পরেই মারাঠারা পুনরায় তাদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল।



নাদির শাহ

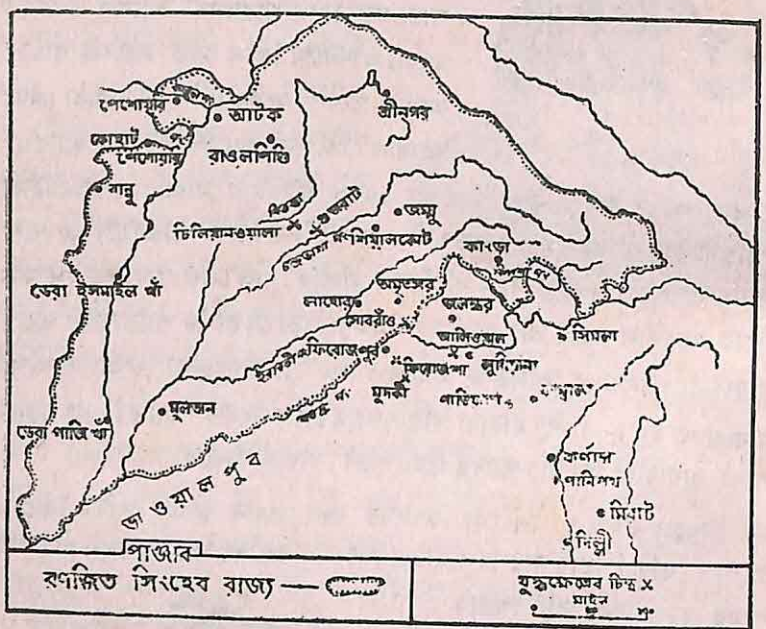
শিখদের উত্থান ঃ শিখদের উত্থানের জন্য প্রধান কৃতিত্ব রণজিৎ সিংহের প্রাপ্য। তাঁর পিতার নাম ছিল মাধো সিংহ। রণজিৎ সিংহের যখন মাত্র বার বৎসর বয়স তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। প্রথম দিকে শিখদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। তারা বিভিন্নগোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এক একটি দলকে মিসল্ বলা হত। রণজিৎ সিংহ যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তার নাম ছিল 'সুকার চাকিয়া'। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রণজিৎ একতা এনেছিলের এবং 'সুকার চাকিয়া' গোষ্ঠী তাঁর নেতৃত্বে শিখদের উত্থানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।



রণজিৎ সিংহ

রণজিৎ অল্পবয়স থেকেই বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি কাবুলের শাসক

জামান শাহকে পাঞ্জাব আক্রমণ করার সময় সাহায্য করেছিলেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে জামান শাহ রণজিৎ সিংহকে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রণজিতের তখন বয়স ছিল মাত্র উনিশ বৎসর। তিনি তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন। কিন্তু রণজিৎ শীঘ্রই আফগানদের নিয়ন্ত্রণ ছিন্ন করেন এবং



সমগ্র পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অঞ্চলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। ইউরোপীয় সেনানায়কদের সাহায্যে তিনি এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন।

কিন্তু রণজিতের সাফল্যে ইংরেজরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। লর্ড মিন্টো চার্লস মেটকাফকে রণজিতের কাছে প্রেরণ করেন। রণজিতের ক্ষমতাবিস্তার রোধ করা ইংরেজদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রণজিৎ সিংহ ইংরেজদের সঙ্গে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি 'অমৃতসরের চুক্তি' নামে পরিচিত। এরপর ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর কোন যুদ্ধ হয় নি। কিন্তু রণজিৎ সিংহ বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজরা একদিন সমগ্র ভারতবর্ষে নিজেদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিতের মৃত্যুর পর শিখ সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

৭ ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার

(ক) প্রথম স্তর : ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত :

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মুঘল সাম্রাজ্য দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছিল। দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা শুরু হওয়ায় একে একে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক শাসনকর্তা এবং বিভিন্ন জাতির মানুষ স্বাধীন হয়ে পড়তে থাকে। এইরূপ পরিস্থিতিতে ইংরেজদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল।

ইংরেজদের ভারতে প্রতিষ্ঠালাভের মূল কেন্দ্র ছিল বাংলা দেশ। এখানে দীর্ঘদিন ধরেই ইংরেজ কোম্পানি লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। জব চার্ণক কলিকাতা পত্তন করায় এখানে কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যও দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। কলিকাতা নগরী পত্তনের সাথে সাথে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়তে লাগল। এখানকার নিরাপত্তার প্রয়োজনে কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ গড়ে তুললো। এই দুর্গ ভারতে ইংরেজদের শক্তিকে যে অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছিল সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়।



সিরাজদৌল্লা

বাংলায় স্বাধীন নবাবীর সূচনা হয়েছে নবাব মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে। তিনি দিল্লীর বাদশাহকে বাৎসরিক খাজনা পাঠাতেন বটে, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে তিনি একজন স্বাধীন নবাবের মতই চলতেন। সেই সময় থেকে দিল্লীর সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। নবাব আলিবর্দী খানের আমলেও এই অবস্থার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু আলিবর্দী খানের পরে তাঁর পৌত্র সিরাজদ্দৌল্লা যখন বাংলার নবাবপদ লাভ করেন তখন থেকে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে তাঁর নানা অজুহাতে বিরোধ দেখা দেয়। সিরাজ ব্যক্তিগত কারণে অনেক দিন থেকেই ইংরেজদের ওপর বিক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সংস্কার এবং সিরাজের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করা নিয়ে তাঁর সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ এক চরম আকার ধারণ করেছিল।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌল্লা ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হন। প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার

ফলে সৈন্যসংখ্যা বেশী থাকা সত্ত্বেও নবাবের সেন্যবাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত হওয়ায় বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরাজরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ইংরেজরা বাংলার নবাবপদে নিজেদের মনোনীত প্রার্থী বসাতে থাকে। অতঃপর ইংরেজরা মীরজাফরকে সিংহাসনে বসায়।

মীরজাফরের কাছ থেকে ইংরেজরা নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে থাকে। ইংরেজ কুঠির প্রধান লর্ড ক্লাইভ এইসূত্রে প্রচুর পরিমাণ অর্থ আদায় করেছিলেন।



মীরজাফর

তাছাড়া কোম্পানির কর্মচারীরা নানা অজুহাতে নবাবের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় করতে থাকে তাকে 'পলাশী লুট' বলা হয়। অল্প কথায় বলতে গেলে, পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাংলার নবাব ইংরেজদের হস্তে পুত্তলিকায় পরিণত হন এবং তিনি ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থসংগ্রহের উৎস হয়ে ওঠেন।

মীরজাফরের পরে নবাব মীরকাশিম যখন সিংহাসনে আসীন হন তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বিপদে পড়তে হয়েছিল। কারণ মীরকাশিম কোম্পানির ক্রমাগত অর্থের দাবি পূরণ করতে অসম্মত হয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, মীরকাশিম কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের ব্যাপারেও আপত্তি জানানোর ফলে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মীরকাশিম তাতে বিচলিত হবার পাত্র ছিলেন না। তিনি নতুনভাবে নবাবের সৈন্যবাহিনীকে গড়ে তুলে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।



মীরকাশিম

যুদ্ধের সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে মীরকাশিম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

সেখানে তিনি সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে ইংরেজদের সঙ্গে শেষবারের মত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হওয়ায় বাংলার কর্তৃত্ব শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

লর্ড ক্লাইভ-এর নেতৃত্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী পদক্ষেপে লর্ড ক্লাইভ মোগল সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানী লাভ করেন (১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে)। তিনি অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে এলাহাবাদ ও কারা প্রদেশ দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমকে অর্পণ করেন। পরিবর্তে লর্ড ক্লাইভ বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দেবার বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী, অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা লাভ করেন। দেওয়ানীর সঙ্গে দেওয়ানী মামলার বিচারের ভার জড়িত থাকায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল। এইভাবে কোম্পানি সুবে বাংলার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠে।



লর্ড ক্লাইভ

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব লাভের পরবর্তীকালে ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তার কর্তৃত্বকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে মহীশূরের হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তাছাড়া মারাঠাদের যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের রাজ্য দখল করে নিয়ে ইংরেজরা ভারতবর্ষে প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিয়েছিলেন হায়দার আলি ও তাঁর পুত্র টিপু সুলতান। পর পর চারটি ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে জয়লাভ করায় মহীশূর রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ চলাকালীন হায়দারের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরোধিতায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ইংরেজদের ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের পথে আর এক প্রবল বাধা ছিল

মারাঠারা। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হবার পরে মারাঠারা আস্তে আস্তে আবার শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে।



হায়দার আলী



টিপু সুলতান

পেশোয়া মাধব রাও মারাঠাদের পুনরুজ্জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মারাঠাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নেতাদের অন্তর্কলহের ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ইংরেজরা মারাঠাদের গৃহবিবাদে এক পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্য করে অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে প্রথম মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে নানা ফড়নবীশের মত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নেতৃত্বে মারাঠারা ইংরেজদের পর্যুদস্ত করতে পেরেছিল। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে সালবাইয়ের সন্ধির দ্বারা মারাঠাদের সংগে ইংরেজদের মৈত্রী স্থাপিত হয়েছিল।



নানা ফড়নবীশ

নানা ফড়নবীশের পরে আবার মারাঠাদের পতন দেখা দেয়। অন্তর্কলহে জর্জরিত মারাঠাদের উপরে ইংরেজরা আবার নতুন করে আঘাত হানল। দ্বিতীয় ইংগ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠা শক্তিকে ইংরেজরা প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল। তা

সত্ত্বেও শেষ চেষ্টা হিসাবে মারাঠারা আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় নেমেছিল। এইবারও মারাঠারা পরাজিত হয়। এর প্রধান কারণ হ'ল মারাঠারা একজোট হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেনি, প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে লড়াই চালিয়েছিলেন। এর পরিণতি হিসাবে মারাঠারা নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়েছিল। মারাঠা রাজ্য ইংরেজদের রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। এই ভাবে বলা যায় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজরা প্রধান দুটো ইংরেজ বিরোধী শক্তিকে পদানত করতে সমর্থ হয়েছিল।

(খ) পরবর্তী স্তর : ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত :

ইংরেজ অধিকারের প্রথম স্তর অর্থাৎ ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যেসব গভর্ণর-জেনারেল আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে লর্ড ওয়েলেসলী ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি অনুসারে একে একে দেশীর রাজ্যগুলোকে অধিকার করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে লর্ড ডালহৌসী তাঁর 'স্বত্ত্ববিলোপ নীতির' সাহায্যে দেশীয় নৃপতিদের রাজ্য দখল করেছিলেন।

যাই হোক, এই স্তরে ইংরেজ শক্তির বিস্তারে দেখা যায় যে, ইংরেজরা সিন্ধু, পাঞ্জাব, অযোধ্যা, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য হস্তগত করেছিল। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধু দেশের আমীরকে অধীনতামূলক মিত্রতা স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু এতে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা মেটেনি। স্যার চার্লস্ নেপিয়ার এর পরে সিন্ধু দেশে এক অভিযানের নেতৃত্ব দান করেন। এই অভিযানের ফলশ্রুতি হিসাবে সিন্ধুদেশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। স্যার চার্লস্ নেপিয়ার এই কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে পুরস্কার হিসাবে সাত লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন।

সিন্ধুদেশের পরে ইংরেজরা পাঞ্জাবকে পদানত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এদিকে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পরে পাঞ্জাবে শিখ নেতাদের মধ্যে চরম অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। শিখ নেতাদের পরস্পর বিবাদে দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনক্ষমতা আর বেসামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল না। সেখানে সামরিক বাহিনী ও তার নেতারা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। এই অবস্থায় রাণী ঝিন্দান সামরিক বাহিনীকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উৎসাহ দিতে থাকেন। শিখরাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজরা সেখানে সৈন্যসামন্ত জড় করেছিল। দুই পক্ষে দু-দুবার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। দু-দুবারই শিখ সৈন্যবাহিনী ইংরেজদের কাছে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। চিলিয়ানওয়ালা ও গুজরাটের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় পাঞ্জাব ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল।

লর্ড ডালহৌসীর আমলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সর্বপ্রধান শক্তিতে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে লর্ড ডালহৌসী স্বত্ববিলোপ নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতি অনুসারে ইংরেজদের আশ্রিত কোন দেশীয় রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে তাঁর রাজ্য ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হবে। এই নীতি অনুসারে সাঁতারা, ঝান্সী, নাগপুর ইংরেজদের অধিকারে আসে। কর্ণাটকের নবাব, পেশোয়া বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানাসাহেব এবং তাঞ্জোরের রাজার দত্তক পুত্রের মাসিক ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। লর্ড ডালহৌসী এইসব ব্যবস্থার মাধ্যমে ইংরেজদের সর্বপ্রধান শক্তিতে পরিণত করলেও এতে দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল।

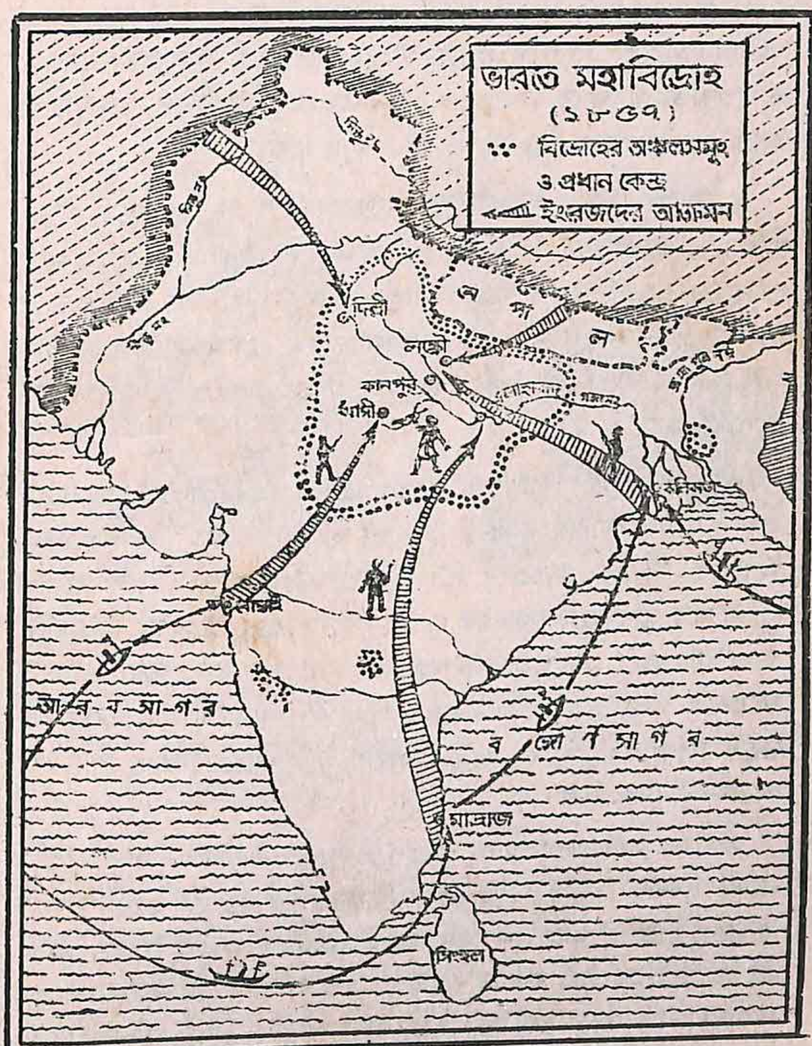

লর্ড ডালহৌসী

(গ) **সিপাহী বিদ্রোহের কারণ, প্রকৃতি ও ব্যর্থতা ঃ**

ইংরেজরা প্রায় একশত বছর ধরে নানাকৌশলে এদেশে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেছিল। সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে ইংরেজরা এদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এমনকি ভারতীয় সিপাহীদেরও বিক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। এর পরিণতি হিসাবে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এক বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকারের অস্তিত্বকে সাময়িকভাবে বিপন্ন করে তুলেছিল।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতীয়দের কাছে লর্ড ডালহৌসীর অনুসৃত নীতি উৎকট সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টান্ত ব্যতীত অপর কিছু ছিল না। একে একে দেশীয় রাজ্যগুলো দখল করার ফলে কেবল দেশীয় নৃপতিরাই নয়, সেখানকার সাধারণ মানুষের মধ্যেও তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। নানাসাহেব ও অন্যান্যদের প্রাপ্য ভাতা বন্ধ করে দিয়ে লর্ড ডালহৌসী রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এর ফলে নানাসাহেব ও তাঁর স্বজাতিরা ইংরেজদের শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন। ডালহৌসীর সম্ভবতঃ সবচেয়ে গর্হিত

কাজ হয়েছিল অযোধ্যার নবাবকে পদচ্যুত করে তার রাজ্য দখল করে নেওয়া। এই ঘটনার ফলে অযোধ্যা রাজ্য ও তার অধিবাসীরা ইংরেজ সরকারের চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছিল।



মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের প্রাপ্য ভাতা বন্ধ করে দেওয়ায় সম্রাটের মর্যাদাহানি ঘটেছিল। সম্রাটের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ায় মুসলিম সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। আবার বেণ্টিঙ্ক ইতিপূর্বে নিষ্কর জমি দখল করে নেওয়ায় সাধারণ কৃষক ও সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল।

ইংরেজরা ভারতে নানাবিধ সমাজ সংস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন। এইসব সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন তা ভারতবাসীর সামাজিক রীতি-নীতিকে যে চূড়ান্তভাবে আঘাত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সতীদাহ-প্রথার বিলোপ, বিধবাবিবাহের প্রচলন প্রভৃতি দেশবাসী ভাল মনে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা ভেবেছিল যে এইসবের মাধ্যমে ইংরেজরা ভারতীয়দের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে দৃঢ়ভাবে আঘাত করতে উদ্যোগী হয়েছে। এর কারণে ভারতীয়রা ইংরেজদের উপর বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল।

ধর্মনৈতিক বিষয়ও ভারতীয়দের ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইন্ধন জুগিয়েছিল। খ্রীষ্টান মিশনারীদের, অর্থাৎ ধর্মপ্রচারকদের কার্যকলাপ ভারতবাসী মোটেই ভাল মনে মেনে নিতে পারেনি। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকরা জোর-জবরদস্তি করে এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছিল। ভারতবাসীর মনে তখন এই আতঙ্ক দেখা দেয় যে ইংরেজরা ভারতবাসীর ধর্মে আঘাত করতে উদ্যোগী হয়েছে।

উপরিউক্ত কারণে ভারতবাসী ইংরেজদের উপর যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তখন নানাবিধ কারণে ভারতীয় সিপাহী বাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সিপাহীদের দূর-দূরান্তে যুদ্ধ করতে যেতে হত। এই কাজের জন্য ভারতীয় সিপাহীরা ভাতা দাবি করলে তা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। আবার সমুদ্রপথে ভারতীয় সেনাদের বহির্ভারতে প্রেরণ করলে গোঁড়া হিন্দুদের মনে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। কারণ হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুসারে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল।

সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহই ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে বিচলিত করে তুলেছিল। ইংরেজ সরকার আতঙ্কিত হয়েছিল। উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে ইংরেজ সরকার 'এনফিল্ড রাইফেল' নামে এক নতুন ধরনের রাইফেল ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। এই রাইফেলে যে টোটা ব্যবহার করতে হত তার ওপর এক ধরনের কাগজ লাগান থাকত। এই কাগজকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে তবেই রাইফেলে টোটা লাগানো হত। এই টোটাতে ব্যবহৃত কাগজে গরু ও শূকরের চর্বি লাগানো আছে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ায় হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা ধর্মনাশের আতঙ্কে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয় দিল্লীর কাছে মীরাট নামক স্থানে। তারপর সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে।

বিদ্রোহী সিপাহীরা গুজরাট থেকে উত্তর প্রদেশের অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব প্রভৃতির নেতৃত্বে সিপাহী বিদ্রোহ এক ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বিদ্রোহীরা বিভিন্ন জায়গায় ইংরেজ শাসকদের উৎখাত করে স্বাধীন মুক্ত এলাকায় পরিণত করেছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত



লক্ষ্মীবাঈ



নানাসাহেব

ইংরেজ-সৈন্যবাহিনীর তৎপরতায় অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে বিদ্রোহকে দমন করা হয়। একে একে নেতারা পরাজয় বরণ করায় মুক্ত অঞ্চলগুলোতে আবার ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে একে নিছক সিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত করা যায় না। কারণ এই বিদ্রোহের বিস্তারের অঞ্চলগুলিতে বিশেষতঃ উত্তর ও মধ্যভারতে সর্বত্রই সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থানও দেখা দেয়। একদিকে যেমন রাজা, রানীরা ও জমিচ্যুত জমিদার অন্যদিকে তেমনি কৃষক, গ্রামীণ কারিগর, পুরোহিত ও মোল্লা অর্থাৎ প্রায় সমস্ত শ্রেণীর মানুষই অংশগ্রহণ করেছিলেন এই বিদ্রোহে। বস্তুতঃ উত্তর প্রদেশ ও বিহারে কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর ব্যাপক অংশগ্রহণের জন্যই এই বিদ্রোহ তীব্রতা লাভ করেছিল। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ে অসামরিক ব্যক্তিরাই বেশী প্রাণ হারিয়েছিলেন।

এই বিদ্রোহ ভারতে সর্বত্র বিস্তৃত হয় নি। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে তা সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারী রাজা, রানী ও জমিদাররাও ছিলেন প্রাচীনত্বের প্রতিনিধি। ইংরেজ শাসনের পরিবর্তে কি ধরনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কেও কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ছিল না। এই সব কারণে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করা যুক্তিসংগত নয়। যাই হোক ইংরেজ শাসনের তীব্র বিরোধিতা, বিস্তারের অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক ও গভীরতা, বিদ্রোহীদের আপোষহীন দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগ, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের মনোভাব, সিপাহী ও সাধারণ মানুষের ঐক্য ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষের মানুষের ব্রিটিশ শাসন বিরোধী সংগ্রামে অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করেছে।

সিপাহী বিদ্রোহ কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত কারণেই ব্যর্থ হয়েছিল। বিদ্রোহীদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী না থাকবার ফলে ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের পরে সেখানে কি ধরনের শাসন প্রবর্তিত হবে সে সম্পর্কে কোন চিন্তার অবকাশ ছিল না। আবার সিপাহী বিদ্রোহে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা আঞ্চলিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দানে সমর্থ হলেও ভারতীয় বিদ্রোহীদের সুগঠিত করা বা তাদের সামগ্রিক নেতৃত্ব দানের ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ হল এই যে বিদ্রোহীরা যেখানে সাধারণ অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে লড়াই করতে নেমেছিল, সেখানে ইংরেজ সৈন্যরা আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে বিদ্রোহীদের দমন করেছিল।

ইংরেজদের পক্ষে এই আংশিক বিদ্রোহকে দমন করা খুবই সহজ হয়েছিল। কারণ এই বিদ্রোহ ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি। কেবল উত্তর ভারতের বিশেষ কতকগুলি অঞ্চলে বিস্তারলাভ করেছিল বলে অপরাপর অঞ্চলের সিপাহীদের সাহায্যে তাদের দমন করার সুবিধা ছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে কোন মিল ছিল না। পরস্পর পরস্পরের প্রতি সন্দিহান ছিলেন। এর পরিণতি হিসাবে সুগঠিত ইংরেজ বাহিনীর কাছে তারা সহজেই পরাস্ত হয়েছিল।

(ঘ) ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল : ভারতীয়দের অসন্তোষ :

ব্রিটিশ শাসনের বিষময় ফলগুলি ক্রমে ক্রমে ভারতের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ইংরেজ সরকারের প্রবর্তিত নতুন ভূমি রাজস্ব ও

অন্যান্য করের বোঝা কৃষক সম্প্রদায়কে অবর্ণনীয় শোষণের শিকারে পরিণত করে। এর বিরুদ্ধে প্রায় বৃটিশ শাসনের প্রথম থেকেই কৃষক সম্প্রদায় অসংখ্য ছোট বড় বিদ্রোহে সামিল হন। কারিগর সম্প্রদায়ও বহুশতাব্দী ধরে যে পেশা গ্রহণ করেছিল তার থেকে বৃত্তিচ্যুত হতে থাকেন। এদেশে বৃটিশ শিল্পে নিযুক্ত বিশেষতঃ চা এবং কফি বাগিচার শ্রমিকদের অবস্থাও ছিল করুণ। ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই কর্মহীনতার শিকার হতে থাকলেন। ভারতীয় শিল্পপতিরাও একথা উপলব্ধি করতে শুরু করলেন, ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতিসমূহের ফলে তাঁদের বৃদ্ধি সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে ভারতের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই এই বোধ জাগ্রত হতে থাকল যে এদেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দুর্দশার মূল কারণ ব্রিটিশ শাসন। আধুনিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসনকে প্রাথমিকভাবে সমর্থন জানালেও ধীরে ধীরে তাঁদেরও মোহভঙ্গ হতে থাকে। তাঁরা উপলব্ধি করলেন ভারতবর্ষকে অনুন্নত করে রাখাই ব্রিটিশ শাসনের উদ্দেশ্য। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসন হয়ে উঠেছিল আরও প্রতিক্রিয়াশীল। এর সঙ্গে যুক্ত হল বর্ণবিদ্বেষমূলক ভাবধারা। এই অভিমত প্রচারিত হল 'সাদা' 'কালো'র চেয়ে সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ ভারতের মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

———

৮ অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপীয় মনীষা বিজ্ঞান ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে বিকাশ লাভ করেছিল। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব বিস্তার লাভ করায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে মানুষ সব ব্যাপারে যুক্তির উপর নির্ভর করে চলতে লাগল। অন্ধ অনুকরণ ও গতানুগতিকতার পথ ত্যাগ করে যুক্তির দ্বারা সবকিছুকে বুঝে তা গ্রহণ করাই ছিল যুক্তিবাদের মূল কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপে এই ধরনের চিন্তাধারা মানুষের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে ঐ সময়কে 'যুক্তিবাদের যুগ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

(ক) আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ঃ

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের কারণ ঃ ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড এই দুটি দেশ স্পেন ও পর্তুগালের সামুদ্রিক আধিপত্যকে ছাড়িয়ে বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। উত্তর আমেরিকায় ইংলণ্ডের ক্রমে ক্রমে তেরটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। এই "ত্রয়োদশ উপনিবেশ"-এর অধিবাসীরা দিন দিনই ইংলণ্ডের উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অবশেষে ইংলণ্ডের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। এই যুদ্ধই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। অনেকে আবার এই যুদ্ধকে "আমেরিকার বিপ্লব" আখ্যা দিয়েছেন।

আমেরিকার উপনিবেশবাসীরা নানা বিপদ তুচ্ছ করে এবং বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে আটলাণ্টিকের উপকূলে এক সমৃদ্ধ ও সুসভ্য সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। ইংলণ্ড আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলির মাতৃদেশ হিসাবে সেখান থেকে নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করত। কেবল তাহাই নয়, ইংলণ্ড উপনিবেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করবার জন্য উপনিবেশের অর্থনীতির উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিল। এই সব বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, তা হল আমেরিকার উপনিবেশকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে রাখা, যাতে আমেরিকা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী না হয়ে উঠতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে,

আমেরিকাস্থ উপনিবেশবাসীরা তাদের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী কেবল ইংলণ্ড থেকেই আমদানি করতে পারতো। নিকটবর্তী অন্যান্য উপনিবেশ-গুলোর সংগে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।



আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলোর উপর ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব যতই থাকুক না কেন আমেরিকার সঙ্গে ইংলণ্ডের দূরত্ব বেশী থাকবার ফলে ইংলণ্ড সবসময় তাদের ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধগুলো যথেষ্ট কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করতে পারত না। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে মাতৃদেশ ইংলণ্ডের অধীনস্থ হলেও উপনিবেশবাসীরা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কার্যত ছিল স্বাধীন।

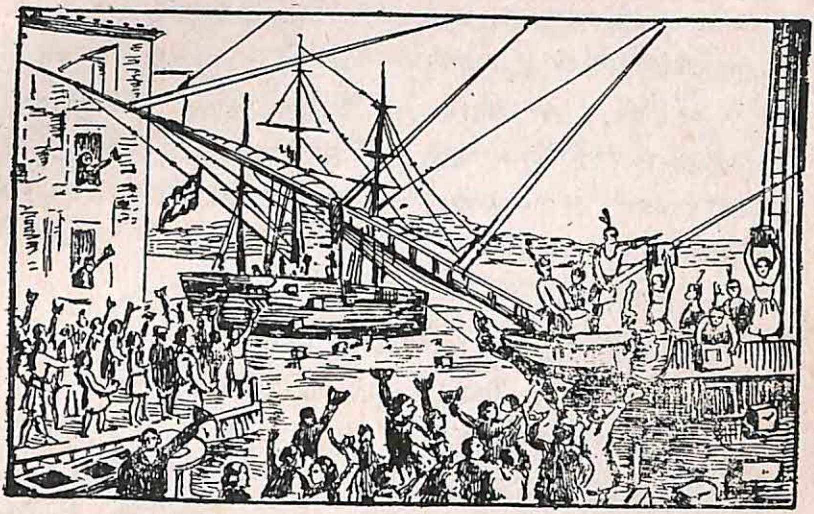
উপনিবেশবাসীরা স্বাধীনতার যে আস্বাদ লাভ করেছিল তা দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করে আসছিল। ইংলণ্ড যখন তাতে নাক গলাতে গেল তখনই লাগলো বিরোধ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংলণ্ড ইউরোপে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তার উপনিবেশগুলি বজায় রাখতে গিয়ে নানা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এইসব যুদ্ধে প্রচুর অর্থ ব্যয় হওয়ার ফলে ইংলণ্ড আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় ইংলণ্ড যখন আমেরিকার উপনিবেশবাসীর কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে উদ্যোগী হয় তখন উপনিবেশ-বাসীরা আপত্তি জানাতে থাকে। এর থেকেই ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকাস্থ উপনিবেশবাসীদের বেধে যায় সংঘর্ষ ও বিবাদ।

আমেরিকার উপনিবেশবাসীরা মূলতঃ ছিল ইংরেজ। নানা সময়ে বিভিন্ন কারণে দেশ ছেড়ে তারা আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল। দীর্ঘদিন আমেরিকায় বসবাসের ফলে এবং সেখানে এক দৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে উঠার ফলে স্বদেশ অর্থাৎ ইংলণ্ডের সঙ্গে তাদের মানসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠে। তারা এক পৃথক জাতিতে পরিণত হয়েছে এই বোধ দেখা দেয়। কর ব্যবস্থা নিয়ে সংঘর্ষ হলে এই জাতীয়তাবোধ স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। ইতিমধ্যে কানাডা থেকে ফরাসী সৈন্য অপসারিত হওয়ায় সেখান থেকে ফরাসী আক্রমণের ভয়ও দূর হয়। এর ফলে ইংলণ্ডের উপর সামরিক নির্ভরতারও আর প্রয়োজন হয় না।

বাস্তবিকপক্ষে ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার উপনিবেশবাসীদের সংগ্রামের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ইংরেজ পার্লামেণ্ট কর্তৃপক্ষ আমেরিকার উপর কর ধার্য করবার নতুন প্রচেষ্টা। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার ফলে ইংরেজরা আর্থিক দিক দিয়ে যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তা কাটিয়ে ওঠবার জন্য ইংলণ্ড উপনিবেশবাসীদের ওপর স্ট্যাম্প কর বা 'স্ট্যাম্প অ্যাক্ট' ধার্য করে বসে। স্ট্যাম্প কর হল এক ধরনের কর যা স্ট্যাম্প বিক্রী করে আদায় করা হত ইংলণ্ডের নির্দেশানুসারে আমেরিকাস্থ উপনিবেশবাসীর ব্যবহৃত সব রকমের দলিলের উপর স্ট্যাম্প লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়।

আমেরিকার উপনিবেশবাসীরা স্ট্যাম্প অ্যাক্টের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলল যে, ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের তাদের ওপর কর ধার্য করবার কোন অধিকার নেই। কারণ সেখানে উপনিবেশবাসীদের কোন প্রতিনিধি নেই। ইংলণ্ড চাপে পড়ে স্ট্যাম্প আইন বাতিল করে দেয় এবং অন্য এক আইনের দ্বারা আরও কয়েকটি জিনিসের উপর কর ধার্য করে বসে। উপনিবেশবাসীরা তাতেও

আপত্তি জানায়। এইবারও ইংলণ্ডকে নতি স্বীকার করতে হল। তবে



বোস্টন বন্দরে সমুদ্রের জলে চায়ের পেটি নিক্ষেপ

ইংলণ্ড কেবল চায়ের উপর কর প্রত্যাহার না করে প্রমাণ করতে চাইল যে, উপনিবেশবাসীদের উপর কর ধার্য করিবার অধিকার তাদের আছে।

চায়ের উপর ধার্য করা করের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে উপনিবেশবাসীরা বোস্টন বন্দরে জাহাজ থেকে চায়ের পেটিগুলো সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল। এই কাজের প্রতিশোধ নিতে ইংলণ্ড বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দেয় এবং সেই প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনাধিকার বাতিল করে বলপূর্বক তাদের ইংলন্ডের কর চাপাবার অধিকারকে মানতে বাধ্য করতে চায়। কিন্তু এর ফল হয়েছিল বিপরীত। উপনিবেশবাসীরা ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য তৈরী হয়।



জর্জ ওয়াশিংটন

ইতিমধ্যে আমেরিকাস্থ ১৩টি উপনিবেশ একসঙ্গে মিলিত হয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করে এবং ইংলন্ডের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে

স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে শুরু হয় সৈন্য সংগঠন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে ইংলণ্ড উপনিবেশবাসীদের কাছে পরাজিত হয়ে আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

স্বাধীনতা-যুদ্ধে আমেরিকার সাফল্যের কারণ ও ফলাফল ঃ উপনিবেশবাসীদের অপেক্ষা ইংলণ্ড সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তারাই জয়ী হয়েছিল। এর প্রথম কারণ হ'ল ইংরেজরা এই যুদ্ধ পরিচালনায় অত্যধিক অব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছিল। যার ফলে স্বাধীনতাযুদ্ধে জয় হয়েছিল উপনিবেশবাসীদের।

জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বেও স্বাধীনতাকামী উপনিবেশবাসীদের জয়লাভের অন্যতম কারণ। জর্জ ওয়াশিংটনের নির্ভীকতা, দক্ষতা ও সৈন্যাপত্য উপনিবেশ-বাসীদের এক গভীর দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। এই অনুপ্রেরণা আমেরিকা-বাসীদের সাফল্যে প্রমাণিত হয়েছিল।

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব থাকায় প্রয়োজনমত ইংলণ্ড সামরিক সাহায্য পাঠাতে পারেনি। তাছাড়া সংবাদ আদান-প্রদানের অসুবিধা মার্কিন ঔপনিবেশিকদের সুযোগ বৃদ্ধি করেছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ চলাকালীন উপনিবেশবাসীরা বৈদেশিক সাহায্য লাভ করেছিল। ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন প্রভৃতি দেশ একই সময়ে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় ইংলণ্ড নিঃসন্দেহে বেকায়দায় পড়েছিল। ফ্রান্স অবশ্য ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকাবাসীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিল।

উপনিবেশবাসীদের গভীর জাতীয়তাবোধ তাদের সাফল্যের অন্যতম কারণ। গভীর দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ উপনিবেশবাসীরা স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল। এই মনোভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই ইংলণ্ডের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ছিল না।

আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। আমেরিকা অল্প সময়ের মধ্যেই অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অন্যান্য দেশেও এই সংগ্রামের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। আমেরিকায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজতন্ত্রের এক বিকল্প শাসনব্যবস্থার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ডে রাজা সাংবিধানিক শাসকে পরিণত হন। শ্রমিকরা ভোটাধিকার পায়। ইংরেজ ঔপনিবেশিক নীতিতে

কিছুটা পরিবর্তন আসে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি শ্বেত উপনিবেশগুলিতে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব ফরাসী স্বেচ্ছাসেবকরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা স্বদেশে ফিরে ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে আমেরিকার সংবিধান ও মানব অধিকারের আদর্শ তুলে ধরেন। ফ্রান্স আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। ফলে ফরাসী রাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায়। এর ফলে ফরাসী বিপ্লব শুরু হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের গণতান্ত্রিক চিন্তা ও মান অধিকারের আদর্শ নিপীড়িত জাতিসমূহের সামনে আশার আলো তুলে ধরে। অনিবার্যভাবে তাই এর প্রভাব পড়ে হল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, জার্মানি এবং ইতালি প্রভৃতি দেশে।

(খ) ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লব ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ ইংলন্ডে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়। এই পরিবর্তনের ফলে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং মানুষের জীবনযাত্রায় এক আমূল পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের মূলে ছিল উৎপাদনের ক্ষেত্রে দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে যন্ত্রশক্তির প্রয়োগ, পুঁজি বিনিয়োগ এবং নিয়োগযোগ্য শ্রমিকের যোগান। একেই শিল্প বিপ্লব বলে। অনেকে অবশ্য একে শিল্পের 'ক্রমবিবর্তন' বলাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে দৈহিক শক্তি এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশুশক্তি ছিল প্রধান। শিল্প ছিল ক্ষুদ্র এবং মূলত কুটির শিল্প। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের যোগান আসত পরিবারের মধ্য থেকেই। এই শিল্পের বাজারও ছিল মূলতঃ স্থানীয়। কিন্তু বহুবিধ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার ফলে প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজনে যোগান সহজ হয়ে ওঠে। যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের ফলে শিল্পও বড় হয়ে ওঠে। অল্প সময়ে প্রচুর উৎপাদন হতে থাকে, দরকার হতে থাকে প্রচুর পুঁজি, কাঁচামাল ও বাজার। উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে সামাজিক জীবনেও অনেক পরিবর্তন আসতে থাকে।

অন্যান্য দেশের থেকে আগেই ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয়। তার কারণও ছিল অনেক। এলিজাবেথের আমল থেকেই ইংরেজ বণিকদের লাভজনক ব্যবসার ফলে ইংলন্ডের হাতে পুঁজির পাহাড় জমে ওঠে। এর আগে ইংলন্ডে পশমের বাণিজ্য থেকে খুব লাভ হতে থাকে। পশমের জন্য পশুপালন করার প্রয়োজনে

কৃষির জমিকে কাজে লাগান হয়। এর ফলে কৃষিতে নিযুক্ত বহুলোক বেকার হয়ে যায়। এই বেকার কৃষকেরাই শ্রমিক হয়ে শিল্প বিপ্লবে সাহায্য করে। ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্রিটিশ তাদের বাণিজ্য বাড়ায়, ব্রিটিশ পণ্যের চাহিদাও বাড়তে থাকে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা ও লোহাও ইংল্যাণ্ডে প্রচুর পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ডের ভগ্ন উপকূল নৌবন্দর গড়ার পক্ষে অনেক সুবিধাজনক। এই সব কারণে প্রথমে ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব হয় এবং পরে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কৃষিবিপ্লব ঃ শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে ওঠায় মানুষ দলে দলে সেখানে কাজে লেগেছিল। তাতে কৃষি উৎপাদনের কাজ স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের সাথে সাথে কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হওয়ার ফলে কৃষি উৎপাদনও আগেকার তুলনায় অনেক বেড়ে গেল।

চাষের নতুন পদ্ধতি, জমিতে সারের ব্যবহার প্রভৃতির ফলে কৃষি-পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এল। এতদিন দু'বছর পর পর একই জমিতে ফসল উৎপাদন করবার পরে তৃতীয় বছর সেখানে চাষ করা হত না, যাতে জমির উর্বরতা কমতে না পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, এক এক বছর জমিতে এক এক ধরনের ফসলের চাষ করলে জমির উর্বরতা ঠিকই থাকে। সুতরাং জমি পতিত ফেলে রেখে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করবার কোন প্রয়োজন হয় না। এই নতুন চাষ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেল। তা'ছাড়া নতুন নতুন ধরনের লাঙ্গল তৈরী হবার দরুন জমির মাটিকে আরও গভীরভাবে চাষ করা সম্ভব হল। কৃষি পদ্ধতিতে এইভাবে পরিবর্তন সূচিত হবার ফলে কৃষি-বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল।

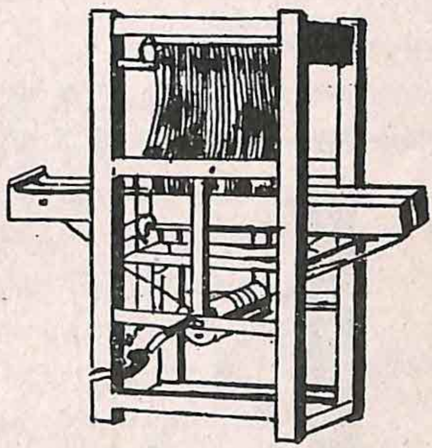
কৃষি-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আবার পশুপালনের ক্ষেত্রেও রীতিমত বিপ্লব ঘটে গেল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশুপালন শুরু করলেন বেকওয়েল নামে জনৈক ইংরেজ যার ফলে দুধ, মাংস প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হল।

শিল্প-বিপ্লবের নতুন নতুন আবিষ্কার ঃ

শিল্প-বিপ্লবের আবিষ্কারকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ (১) সুতা ও বয়নশিল্পের আবিষ্কার, (২) লোহা ও কয়লা শিল্পের আবিষ্কার ও (৩) পরিবহণ।

(১) **বয়ন শিল্প ঃ**

শিল্প-বিপ্লব সর্বপ্রথম বয়নশিল্পের জগতেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে জন কে নামে জনৈক ইংরেজ কলের মাকু আবিষ্কার করে বয়নশিল্পে বিপ্লব ঘটালেন। কলের মাকুতে খুব স্বাভাবিক ভাবেই খুব তাড়াতাড়ি বয়নের কাজ করা সম্ভব হল। এতে আবার সুতোর চাহিদা বেড়ে গেল। বেশী সুতোর যোগান দেওয়া সম্ভব হল যখন হারগ্রীভস্ স্পিনিং জেনী নামে নতুন এক যন্ত্র আবিষ্কার করলেন।



উন্নত ধরনের বস্ত্রবয়ন যন্ত্র

১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে আর্করাইট জলের স্রোতের থেকে শক্তি নিয়ে সুতো কাটবার যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। যার ফলে সুতো কাটবার ক্ষেত্রে এল এক বিপ্লব। তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে খুব শক্ত সুতো কাটা সম্ভব হল। আর্করাইটের পরে উল্লেখ করতে হয় ক্রম্পটনের কথা। শোনা যায়, নিজে গান করবার জন্য তিনি একটা বীণা তেরী করতে শুরু করেছিলেন যা থেকে তিনি যন্ত্র তৈরীর প্রেরণা লাভ করেন। ক্রম্পটনের আবিষ্কৃত 'মিউল' থেকে অতি সক্ষ্ম সুতো পাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

ক্রম্পটনের মিউলের আবিষ্কারে উৎসাহিত হয়ে কার্টরাইট বাষ্পচালিত তাঁত আবিষ্কার করেছিলেন। এই আবিষ্কারের ফলে বয়ন শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল।

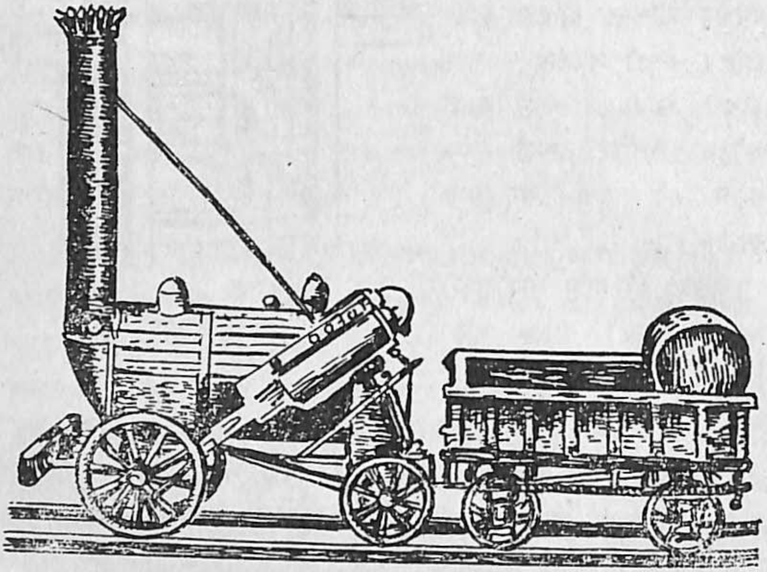
(২) **কয়লা ও লোহ শিল্প ঃ**

শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রভূত পরিমাণ যন্ত্রপাতি তৈরী হতে থাকে তার জন্য প্রয়োজন হল লোহার। এই লোহা গলানোর পদ্ধতি আগেও মানুষের জানা ছিল। কিন্তু এই সময় থেকে সেই পদ্ধতি আরও সহজ হল। কিন্তু হেনরী কোর্ট নামে জনৈক ব্যক্তি কয়লার সাহায্যে লোহা গলানোর

পদ্ধতি আবিষ্কার করবার ফলে উন্নত মানের লোহা পাওয়া সম্ভব হল। আবার ইস্পাত তৈরী হতে থাকায় শক্তিমান যন্ত্র প্রভৃতি নির্মাণ করা সহজ হল। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, কয়লা ও লোহার ব্যাপক ব্যবহার শিল্প-বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল।

(৩) **পরিবহণ ব্যবস্থা :**

যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটান সম্ভব নয়। আবার শিল্প-বিপ্লবের জন্যও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি একান্ত



বাষ্পচালিত গাড়ি

প্রয়োজন। কাঁচামাল ও তৈরী জিনিসপত্র পরিবহণ করবার জন্য শুরু হল রাস্তাঘাট নির্মাণ, যানবাহনের উন্নতি সাধন।

রাস্তাঘাটের অসুবিধা দূর করবার জন্য টেলফোর্ড ও ম্যাকাডাম যথাক্রমে পিচ-ঢালা রাস্তা এবং সেতু নির্মাণ শুরু করলেন যার ফলে পরিবহণ ব্যবস্থা সুগম হয়ে উঠল।

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে জর্জ স্টিফেনসন বাষ্পীয় গাড়ি তৈরী করলে রেলগাড়ির সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মাল পরিবহণ সহজ হল। স্থলপথে যানবাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জলপথে বাষ্পীয় জাহাজ ইত্যাদি নির্মিত হতে থাকে, যার ফলে জলপথে যাতায়াত সহজসাধ্য হয়।

শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল ঃ শিল্প-বিপ্লবের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবনযাত্রায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। নতুন উৎপাদন-পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণ জিনিস উৎপন্ন হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেল। ইংলন্ড কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীর সবচেয়ে শিল্পোন্নত ও ধনী দেশে পরিণত হল।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে কল-কারখানায় অল্প আয়াসে সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী হতে থাকায় মানুষের জীবন-যাপন সহজ হল। জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পেল এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেবল ইংলন্ডে তৈরী হওয়ায় বিভিন্ন দেশের ইংলন্ডের ওপর নির্ভরশীলতাও বেড়ে গিয়েছিল।

শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডের সর্বত্র যে কল-কারখানা গড়ে উঠতে থাকে সেখানে কাজ করবার জন্য বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। কলকারখানা শহরাঞ্চলে গড়ে ওঠায় গ্রাম্য কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়।

কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফল শুধু শুভই হল না। শিল্পনগরীগুলি জনাকীর্ণ হয়ে উঠল। দরিদ্র শ্রমজীবীরা নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর বস্তিগুলিতে বসবাস করতে বাধ্য হল। অল্প বেতনের জন্য তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হত। ব্যাপকভাবে নারী ও শিশুশ্রমিক নিযুক্ত হতে থাকল, ফলে পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হতে থাকল। প্রথমে এই অবস্থা থেকে প্রতিকার পাবার শ্রমিকদের কোন উপায় ছিল না, কেননা তাদের ভোটাধিকার ছিল না। আস্তে আস্তে শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তাদের অবস্থারও পরিবর্তন হয়।

(গ) ফরাসী বিপ্লব ঃ

ফরাসী বিপ্লবের কারণ ঃ দার্শনিকদের প্রচার ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যেখানে এক আমূল পরিবর্তন সংঘটিত করতে না পারলে দেশের উন্নতি কোনভাবেই সম্ভবপর ছিল না। ফরাসী মনীষীরা দেশের অবস্থা দেখে বিচলিত হয়েছিন। ভলতেয়ার, রুশো, মন্টেস্কু, ডেনিস, দিদেরো ও আরও অনেক দার্শনিক তাঁদের রচনা ও প্রচারপত্রের সাহায্যে সমসাময়িক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রুটিগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন।

ফরাসী রাজারা যে স্বৈরাচারী ও ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন তাকে সমালোচনা করে ভলতেয়ার তাঁর লেখনী চালনা করেছিলেন। তিনি

বলতে লাগলেন ধর্মযাজকেরা যে পদ্ধতিতে মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করতে চাইছে তাতে মানুষের পাপ আরও বেড়েই চলেছে। সুতরাং সেই পথে মুক্তি সম্ভব নয়।



ভলতেয়ার

রুশো তাঁর 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থে লিখলেন যে, সব মানুষই স্বাধীন হয়ে জন্মেছে। বিধিপ্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে রাজা শাসনকার্য পরিচালনা করেন না। রাজা শাসনকার্য পরিচলনা করে থাকেন প্রজাদের সম্মতির উপর। যেদিন রাজার প্রতি প্রজাদের সমর্থন থাকবেনা সেদিনই তিনি শাসনক্ষমতা হারাবেন। রুশোর এই বৈপ্লবিক বক্তব্য ফরাসীবাসীকে নিদারুণ-ভাবে প্রভাবিত করেছিল। কেবল ফ্রান্স কেন, সমগ্র পৃথিবীতে রুশোর বক্তব্য এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

মণ্টেস্কু ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একজন উগ্র সমর্থক ছিলেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, রাজা জনসাধারণের সম্মতি অনুসারে চলবেন এবং তিনি নিয়মতান্ত্রিক পথে দেশ চালাবেন, সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন অবকাশ নেই।



মণ্টেস্কু

একথা অনস্বীকার্য যে, ফরাসী সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের উপরিউক্ত বক্তব্য ফরাসীবাসীর মনে এক আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। দীর্ঘদিন স্বৈরাচারী রাজার শাসনাধীন থাকার ফলে তাঁদের মনের যে আশাহীনতা ও হতাশার মনেভাব দেখা দিয়েছিল তা তাদেরকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

ফরাসীরাজদের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের ইষ্ট-অনিষ্টর সঙ্গে কোন যোগাযোগ, শাসনব্যবস্থা ছিল না। রাজার নির্দেশই ছিল দেশের আইন। তাছাড়া ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দূরবস্থা তখন এক চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা ষোড়শ লুই করতে পারেন নি। তিনি অধিকমাত্রায় তাঁর স্ত্রী মেরী আন্তোনিয়েৎ ও অপরাপর কয়েকজন অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষের অধীনে থাকবার ফলে ব্যক্তিগত সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি কোনভাবেই দেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করতে পারেননি।

ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা এক চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। সমাজের সব রকমের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবার একমাত্র অধিকারী ছিল অধিকারভোগী সম্প্রদায়। আর অধিকারহীন সম্প্রদায়



মেরী আন্তোনিয়েৎ



ষোড়শ লুই

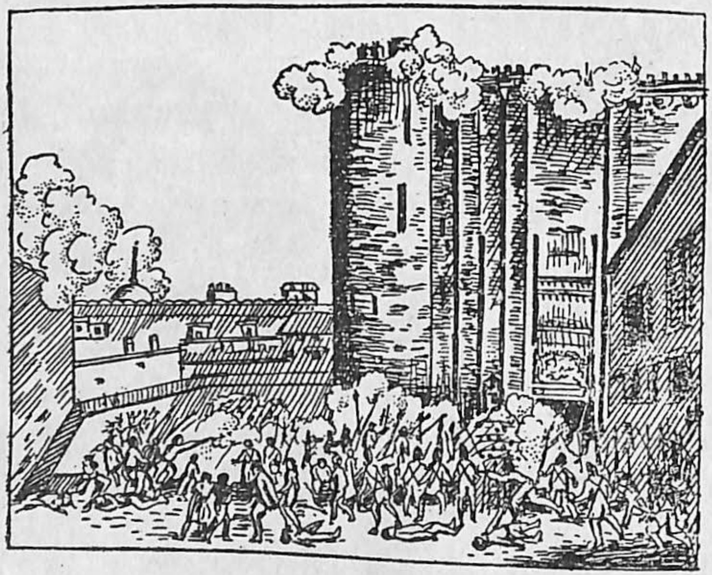
সমাজের দায়িত্ব পালন করলেও তাদের কোন রকমের অধিকার ছিল না। সব রকম অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল।

ফরাসীবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থাও সেই আমলে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। সরকারী আয় অপেক্ষা ব্যয় ছিল বেশী। কৃষকদের কাছ থেকে নানা রকম কর আদায় করা হত, যার ফলে তাদের আয়ের এক মোটা অংশ কর বাবদ চলে যেত। অভিজাত সম্প্রদায় কিন্তু কর দিত না। তারা যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত ঐগুলির মধ্যে কর না দেওয়ার অধিকার অন্যতম। যাই হোক,

অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ষোড়শ লুই যে জাতীয়-শোভা অহ্বান করেছিলেন তা থেকেই শুরু হয়েছিল ফরাসী বিপ্লব।

ফরাসী বিপ্লবের গতি ঃ চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে ষোড়শ লুই যখন জাতীয় সভা স্টেটস্ জেনারেল আহবান করলেন (১৭৮৯ খ্রীঃ) তখন ফরাসীবাসীর মনে দারুণ উত্তেজনা ও উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। তারা ভাবতে লাগলো যে, এই প্রতিনিধি-সভার মাধ্যমে তারা তাদের দীর্ঘদিনের অভাব-অভিযোগ মেটাতে সমর্থ হবে।

জাতীয় সভায় তৃতীয় সম্প্রদায়, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি সমবেত হয়ে নানা দাবি উত্থাপন করতে লাগল। কিন্তু রাজা ষোড়শ লুই এইসব দাবিকে আমল দিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এমনকি রাজা শেষ পর্যন্ত



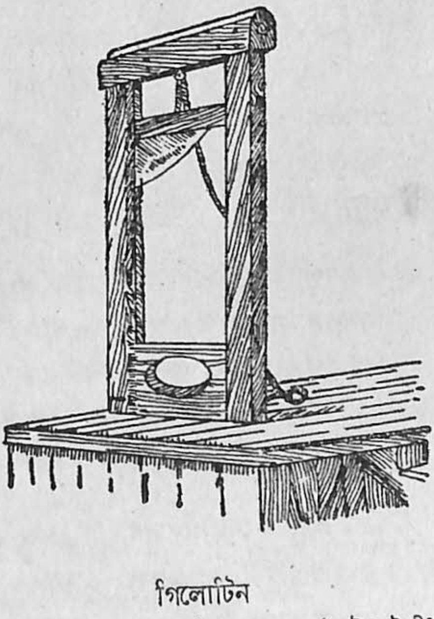
বাস্তিল দুর্গের পতন

জাতীয়-সভার অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন। এমতাবস্থায় জাতীয়-সভার সদস্যরা নিকটবর্তী টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হয়ে এক শপথ নিলেন যে, তারা মিলিতভাবে দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা করবেন। স্বাভাবিকভাবেই জাতীয়সভা এখন জাতীয় মহাসভায় পরিণত হল; ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই এক উন্মত্ত জনতা বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে স্বৈরাচারী শাসনের প্রতীক বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটালো।

এদিকে জাতীয় মহাসভার কাজ অনেকখানি এগুতে থকে। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে এক নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করে স্বৈরাচারী রাজাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজায় পবিণত করা হল। রাজার বিশেষ ক্ষমতাগুলো কেড়ে নেওয়া হল। তিনি এখন থেকে জনপ্রতিনিধিদের সাহায্য ও পরামর্শ নিয়ে দেশ শাসন করতে বাধ্য থাকবেন। রাজা ষোড়শ লুই-এর এসব কাজ মোটেই পছন্দ ছিল না। তিনি জনপ্রতিনিধিদের বিরোধিতা করতে লাগলেন। এমন কি, তিনি এক সময় দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে উদ্যোগী হন।

ষোড়শ লুই দেশ থেকে পালাতে গিয়ে জনসাধারণের হাতে বন্দী হওয়ায় রাজার যতখানি সম্মান তখনও অবশিষ্ট ছিল তাও তিনি হারালেন। জনসাধারণের হাতে বন্দী হওয়ায় ফ্রান্স প্রকৃতপক্ষে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের রাজার সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্য অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি দেশ ফ্রান্স আক্রমণ করে বসেছে। এই অবস্থা সামাল দেবার জন্য ফ্রান্সে এক নতুন ধরনের শাসন প্রবর্তিত হয় যাকে 'ভীতির শাসন' বলা হয়।

'ভীতির শাসন' ফরাসী প্রজাতন্ত্র রক্ষা এবং বহিরাক্রমণ থেকে ফ্রান্সকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ব্যপক সন্ত্রাস শুরু করেছিল। এই শাসনকালে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রাজা ষোড়শ লুইকে 'গিলোটিন' যন্ত্রে হত্যা করা হয়। কেবল রাজাই নয় সন্ত্রাসের শাসনের সময় হাজার হাজার মানুষকে নানা অভিযোগে হত্যা করা হয়েছিল। ভীতির শাসনের সৃষ্টিকর্তা ছিলেন রোবস্পীয়ার। রোবস্পীয়ারের প্রাণদণ্ডের সাথে সাথে ভীতির রাজত্বের অবসান ঘটে।



গিলোটিন

ভীতির শাসনের পরিসমাপ্তির পরে পাঁচজন 'ডাইরেক্টর'-কে নিয়ে এক নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এই ব্যবস্থা 'ডাইরেক্টরী'

নামে খ্যাত। ডাইরেক্টরী ফ্রান্সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। দেশের সর্বত্র দেখা দিয়েছে বিদ্রোহ। আবার সেই সময় বহিরাক্রমণও নতুনভাবে শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় ফ্রান্সের অন্যতম সামরিক সেনাপতি নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরীকে পদচ্যুত করে দেশের শাসনব্যবস্থা নিজের হাতে নিয়ে নেন।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ঃ নেপোলিয়ান এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ফ্রান্সের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন। অবরুদ্ধ টুলো বন্দর উদ্ধার করায় তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ডাইরেক্টরীর আমলে ইটালী অভিযানে সফলতার গৌরবে তিনি হয়ে ওঠেন জাতীয় বীর। অতঃপর ডাইরেক্টরীকে পদচ্যুত করে তিনি যে নতুন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তার নাম 'কনসুলেট'। তিনি ছিলেন সেই শাসনব্যবস্থায় প্রথম কনসাল। প্রথম কনসাল হিসাবে তিনি ফরাসী দেশে নতুন আইনব্যবস্থার প্রচলন করেন। নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি প্রবর্তন করে তিনি ফ্রান্সকে আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন।



নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

ফরাসী জনতাও দীর্ঘদিন যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে শান্তি চাইছিল এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য। নেপোলিয়ানের শাসন সংস্কার তাঁকে আরো জনপ্রিয় করে তুলল।

ইতিমধ্যে ইউরোপের যেসব দেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল নেপোলিয়ান সাফল্যের সঙ্গে কেবল তাদের প্রতিহতই করেন নি; একের পর এক দেশ জয় করে তিনি ঐসব দেশকে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। নেপোলিয়ান যেসব দেশে উপস্থিত হয়েছিলেন সেখানেই তিনি ফরাসী বিপ্লবের ধ্বনি, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ছড়িয়েছিলেন।

সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ান ঃ ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়ান নিজেকে ফরাসীদের 'সম্রাট' বলে ঘোষণা করেন। এই সময় থেকে ক্রমেই তিনি রাজ্যজয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়েছিলেন। জার্মানি, হল্যান্ড, প্রাশিয়া একে একে তাঁর

পদানত হল। তিনি তারপর রাশিয়া আক্রমণ করে বসলেন। স্পেন এবং পর্তুগালও তাঁর আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি।

বিভিন্ন দেশের উপর তিনি যেভাবে আক্রমণ চালিয়েছিলেন তাতে ক্রমেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ইংলণ্ড তাঁর আক্রমণকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করতে পেরেছিল। তারপর পর্তুগাল, স্পেন প্রভৃতি সম্মিলিত বাহিনীর কাছে তিনি পরাজিত হন। পেনিনসুলার যুদ্ধ ও রাশিয়ার আক্রমণে পরাজিত হয়ে নেপোলিয়ান এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত হন। এগারো মাস সেখানে নির্বাসিত জীবন-যাপনের পরে শেষবারের মত তিনি ফ্রান্সে ফিরে এসে সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শেষ পর্যন্ত



ওয়াটারলুর যুদ্ধে ইংলণ্ডের ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন। এখানে নির্বাসিত জীবন-যাপনের পরে তিনি ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল ঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের যা অবস্থা ছিল তাকে ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কতকগুলি বিশেষ কারণের দরুন বিপ্লব ফ্রান্সেই প্রথম শুরু হয়েছিল। এর ফলে ফ্রান্সে যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা জন্মলাভ করে তার প্রভাব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিফলিত হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের ফলে জন্ম, ধর্ম ও শ্রেণীবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের অবসান ঘটেছিল।

ফরাসী বিপ্লব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষ ঐসব প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে দেশে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের পরে বারংবার ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে অগ্রাহ্য করা সত্ত্বেও তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত সব দেশেই ফরাসী বিপ্লবের ধ্বনি জয়যুক্ত হয়েছিল।

গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ ইউরোপের মানুষ যে তীব্র আন্দোলন শুরু করেছিল তা জার্মানি, বেলজিয়াম, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। তাছাড়া শাসন ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণের যে আদর্শ ফরাসী বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করেছিল তা ইউরোপের রাজতন্ত্রশাসিত দেশগুলিতে কম আলোড়নের সৃষ্টি করেনি।

———

১ ১৮১৫ সাল থেকে ইউরোপের ইতিহাস

(ক) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ঃ

ফরাসী বিপ্লব প্রসূত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ইউরোপের এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই সময় ইউরোপের বিভিন্ন পরাধীন জাতি শুরু করেছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। কিন্তু সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমসাময়িক ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতারা কোনভাবেই বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। স্বভাবতঃই ইউরোপে শুরু হয়ে যায় এক নতুন সংঘর্ষ। একদিকে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আদর্শ, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রনেতাদের ঐ দু'টি উদারনৈতিক আদর্শের বিরোধিতা।

১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় ভিয়েনা সম্মেলন। সেই সম্মেলনে সমবেত রাষ্ট্রপ্রধানরা ইউরোপের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর ছিল না। তারা যেভাবে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অস্বীকার করে ফরাসী বিপ্লবের আগেকার ইউরোপকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তাতে ইতিহাসের ঘটনাকে সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করা হয়। আবার ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তকে অপরিবর্তিত রাখবার জন্য, তাকে স্থায়ী করবার জন্য ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনেতারা একটি সমবায় গঠন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

ভিয়েনা কংগ্রেসের গৃহীত নীতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'ন্যায্য অধিকার' অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগে যে রাজবংশ যেখানে রাজত্ব করতো তাদের সেখানে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। এই নীতি কার্যকর করতে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই ফরাসী বিপ্লবের শিক্ষাকে অস্বীকার করতে

হয়েছিল। এই নীতি অনুসারে ফ্রান্সে বহু ঘৃণিত বুরবোঁ-পরিবারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। সার্ডিনিয়া-পীডমণ্টে স্যাভয় রাজবংশকে এবং হল্যাণ্ডে



১৮১৫ সালে ইওরোপ

অরেঞ্জ রাজবংশকে পুনঃস্থাপিত করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা যে ঐ সব রাজ্যের মানুষের মনঃপূত ছিল না তা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়।

যাই হোক, ভিয়েনা কংগ্রেসে গৃহীত ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দান করবার জন্য ব্যবস্থা হয় 'পবিত্র চুক্তি' ও 'চতুঃশক্তি চুক্তি'র। অবশ্য পবিত্র চুক্তির ব্যর্থতার পরে চতুঃশক্তিই সাফল্য লাভ করেছিল। সমসাময়িক ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী কুটনীতিবিদ মেটারনিক ছিলেন এই 'চতুঃশক্তি চুক্তি'র স্রষ্টা। তিনি এই ইউরোপীয় সংস্থার মাধ্যমে ইউরোপে প্রাক্ বিপ্লব অবস্থা বজায় রাখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

চতুঃশক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, ইউরোপের কোন জায়গায় গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দিলে তাকে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে। ভিয়েনা চুক্তিকে সামান্যতমভাবে কেউ যদি আঘাত করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে তাকে উপযুক্ত শাস্তিদান করতে হবে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী সব রকমের আন্দোলনকে দমন করে ইউরোপের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাই ছিল এই 'চতুঃশক্তি চুক্তি'র উদ্দেশ্য।

মেটারনিক ছিলেন অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী। তিনি নিজ দেশে উদারনৈতিক আন্দোলনকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেননি। কেবল অস্ট্রিয়াতেই নয়, ইউরোপের সর্বত্র যাতে উদারনৈতিক চিন্তাধারা প্রসার না ঘটতে পারে সেজন্য তিনি নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এসব ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে 'মেটারনিক পদ্ধতি' নামে অভিহিত।

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংঘর্ষ ইউরোপে একাধিক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বারংবার বিদ্রোহের মাধ্যমে ভিয়েনা কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে থাকে। ফরাসী বিপ্লবের উদারনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশগুলো একের পর এক আন্দোলন করে তাদের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে উদ্যোগী হয়েছিল। মেটারনিক তথা চতুঃশক্তির প্রচেষ্টায় সেই আন্দোলনকে সাময়িকভাবে প্রতিহত করা সম্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত উদার নীতি জয়লাভ করেছিল।



মেটারনিক

উদারনৈতিক আন্দোলন ফ্রান্সেই প্রথম শুরু হয়। সেখান থেকে আন্দোলনের ধারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে উদারনৈতিক আন্দোলন শুরু হয় স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের মাধ্যমে ফরাসীবাসী ভিয়েনা কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তারপরে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করে ফরাসীবাসী ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছিল। ফ্রান্সে ১৮৩০ ও ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষের মনে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল। সেই সূত্র ধরে অস্ট্রিয়া, ইতালি ও জার্মানির বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন শুরু হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইতালি ও জার্মানির আন্দোলনকারীদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হলেও তারা তাদের জাতীয় দাবি পূরণের জন্য ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে তাকে সার্থক করে তুলতে সমর্থ হয়েছিল।

(খ) ইতালির ঐক্য আন্দোলন ঃ

ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইতালি ছিল পরস্পর বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি রাজ্যের সমষ্টি। সমস্ত দেশে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যখন ইতালি জয় করেন তখন তা ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়েছিল। নেপোলিয়ানের অধীন থাকাকালীন সেখানে একই শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া নেপোলিয়ান কতকগুলি সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন



করে ইতালিবাসীদের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ইতালিবাসীরা তাই নেপোলিয়ানকে ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত হিসাবে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইতালিতে পুনরায় অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পুরাতন প্রভুর

শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ইতালিবাসীদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাছাড়া অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিকের দমননীতির ফলে ইতালির মানুষ আবার আগেকার মত নির্যাতিত হতে থাকে। ইতালির মানুষের মনে যখন গভীর হতাশা দেখা দিয়েছে তখন কয়েকজন দেশপ্রেমিকের নেতৃত্বে ইতালিবাসীরা এক নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিল। ইতালিবাসীর স্বাধীনতা ও ঐক্য সংগ্রামে দেখিয়েছিলেন ম্যাৎসিনি, কাভুর, গ্যারিবল্ডী প্রমুখ।

ম্যাৎসিনি ইতালির জেনোয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন (১৮০৫ খ্রীঃ)। তিনি অল্প বয়স থেকেই ইতালির ঐক্যের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত 'ইয়ংইতালি' আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। ম্যাৎসিনি চাইছিলেন ইতালির যুব সমাজকে স্বাধীনতা ও ঐক্য-সংগ্রামের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করতে। তিনি মনে করতেন যে, ইতালির যুবকরা যদি ইচ্ছা করে তাহলে অল্পদিনের মধ্যে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না। ম্যাৎসিনির আদর্শে অনুপ্রাণিত ইতালির যুবকরা তীব্র আন্দোলন শুরু করেছিল দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে। কিন্তু অস্ট্রিয়ার সামরিক তৎপরতার ফলে সেই আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। ম্যাৎসিনিকে ভোগ করতে হয়েছিল কারাদণ্ড।



ম্যাৎসিনি

ম্যাৎসিনির নেতৃত্বে ইতালির ঐক্য আন্দোলনের ব্যর্থতার পর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন কাউন্ট কাভুর। ম্যাৎসিনির মত কাভুরও অল্প বয়স থেকেই ইতালির ঐক্যের স্বপ্ন দেখতেন। কাভুর ম্যাৎসিনির কর্মপন্থার ব্যর্থতা দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, দীর্ঘদিন যাবৎ যারা নিঃস্বার্থভাবে দুঃখবরণ করে ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে তাদের স্বদেশপ্রেমের কোন অভাব না থাকলেও ঐ পদ্ধতিতে ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে না।

কাভুর তাই স্থির করলেন যে, ইতালিকে পীডমণ্ট্-সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং সেজন্য ইতালির শত্রু অস্ট্রিয়াকে দেশ থেকে

বিতাড়িত করতে হবে। তিনি আরও বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিদেশী শক্তির সাহায্য ও সমর্থন ব্যতীত ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবেনা।



কাভুর

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় কাভুর রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগদান করে ঐ দুই দেশের সহযোগিতা লাভ করেন। অতঃপর কাভুর ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্য প্রার্থনা করলেন যাতে তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফ্রান্সের সাহায্য পেতে পারেন। অল্পদিনের মধ্যেই অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কাভুর লম্বার্ড অধিকার করলেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই পার্মা, মোডেনা ও টাস্কেনি স্বেচ্ছায় সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে রাজী হয়।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ ইতালির নেপলস্ ও সিসিলির অধিবাসীরা তথাকার বুরবো রাজবংশের অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন গ্যারিবল্ডী। তিনি সসৈন্যে সেখানে উপস্থিত হয়ে নেপলস্ ও সিসিলি জয় করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে রোম অধিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এসময় সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল রাজনৈতিক কারণে গ্যারিবল্ডীকে বাধা দান করেন।



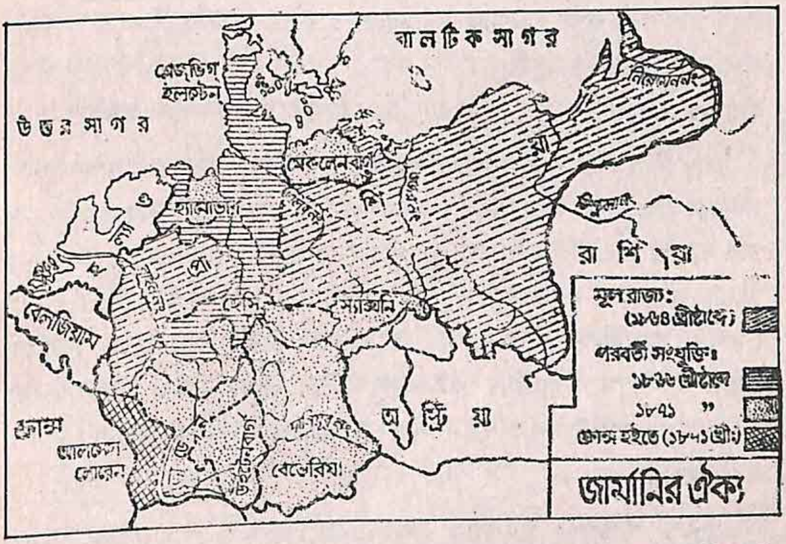
গ্যারিবল্ডী

দক্ষিণ ইতালির নেপলস্ ও সিসিলি পীডমন্ট-সার্ডিনিয়া রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে ভেনিশিয়া ও রোম ব্যতীত প্রায় সমগ্র ইতালি

ঐক্যবন্ধ হয়েছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভেনেশিয়া ও রোম ব্যতীত সমগ্র ইতালির মানুষ ভিক্টর ইমানুয়েলকে ইতালির 'রাজা' বলে ঘোষণা করেছিল।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অস্ট্রিয়া ইতালি থেকে যখন বিতাড়িত হয় তখন ভেনেশিয়া ইতালির অংশে পরিণত হয়েছিল। আবার যখন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ হয় তখন ইতালি প্রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে। এই যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হওয়ায় রোম থেকে সে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ রোম এবার ইতালির সঙ্গে যুক্ত হল। এভাবে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির ক্য সম্পূর্ণ হয়।

জার্মানির ঐক্যসাধন ঃ ফরাসী বিপ্লবের আগে জার্মানি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তবে পবিত্র রোমান সম্রাট কার্যতঃ সেখানে তেমন কর্তৃত্ব করতে পারতেন না। এখানে অবশ্য অস্ট্রিয়ার প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সময়



জার্মানির ঐক্য

থেকে প্রাশিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠলে সে জার্মানির সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। জার্মানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা সর্বদাই নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতেন। এই অবস্থা থেকে এক ঐক্যবন্ধ জার্মানি গড়ে উঠেছিল এবং তার নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রাশিয়া।

ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী আদর্শ জার্মানির মানুষের মধ্যে এক অদম্য প্রেরণা জাগ্রত করেছিল। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফরাসী সম্রাট হিসাবে

সমগ্র ইউরোপে যখন নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছেন তখন জার্মানিও ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ে। জার্মানির মানুষ ফরাসী প্রভুত্ব মেনে নিলেও অন্তর থেকে তা গ্রহণ করতে পারেনি। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, নেপোলিয়ানের অধীনস্থ থাকাকালীন জার্মানিবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। একই শাসনাধীন থাকবার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত জার্মানির মানুষের মধ্যে একতাবোধ জাগ্রত হয়েছিল। তাছাড়া নেপোলিয়ানের অধীন থাকা অবস্থায় ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী জার্মানবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

নেপোলিয়ানের পতনের পরে ভিয়েনা সম্মেলন জার্মান জাতির নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছিল। ভিয়েনা সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্রনেতারা ফরাসী বিপ্লবের আগেকার অবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করতে গিয়ে জার্মানির উপর পুনরায় অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করলেন। ৩৯টি জার্মানরাষ্ট্র নিয়ে যে রাষ্ট্রজোট গঠন করা হল তার নেতৃত্ব পদে অস্ট্রিয়াকে স্থাপন করা হয়। বলা বাহুল্য, এতে জার্মানির মানুষ খুবই বিক্ষুব্ধ হয়েছিল।

জার্মানবাসীদের ঐক্য-আন্দোলনের প্রথম দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে যে বিপ্লব দেখা দেয় তার সূত্র ধরে জার্মানির বিভিন্ন জায়গায় গণজাগরণ দেখা দিয়েছিল। আবার ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে যখন ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দেয় তখনও জার্মানির বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে জার্মানির আন্দোলনকারীরা একটি অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে ফ্রাঙ্কফোর্ট নামক স্থানে সমবেত হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেনি।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে যখন বিসমার্ক নামে জনৈক ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করলেন তখন ঐক্য সংগ্রাম এক সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে থাকে। জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিসমার্ক প্রাশিয়ার পার্লামেণ্টের একজন নির্বাচিত সদস্য হিসাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন। বিসমার্ক অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল কিভাবে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়।

বিসমার্ক ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শক্তির সাহায্যে বিদেশী শক্তিকে জার্মানি থেকে বিতাড়িত করতে পারলে তবেই জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি



বিসমার্ক

শক্তি অর্জনের দ্বারা প্রাশিয়াকে শক্তিশালী করে তুলতে চাইলেন। কিন্তু প্রাশিয়ার পার্লামেন্টের সদস্যরা শক্তির দ্বারা জার্মানির ঐক্যসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাদের ইচ্ছা ছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঐক্যসাধন। এমতাবস্থায় বিসমার্ক পার্লামেন্টকে অস্বীকার করে জার্মানির শক্তিবৃদ্ধি করতে থাকেন।

প্রথমেই বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সহযোগিতায় ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শ্লেজভিগ ও হলস্টেন অধিকার করে নেন। তারপরে তিনি অস্ট্রিয়াকে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় প্ররোচিত করেন। অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়া যুদ্ধ সাত সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়েছিল। এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়া শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়ে জার্মানির উত্তর ও মধ্য অঞ্চলের প্রাশিয়ায় আধিপত্য স্বীকার করে নেয় এবং জার্মান রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়। প্রাশিয়ার বিসমার্ক জার্মানির ঐক্য-সাধনের জন্য শেষ যুদ্ধ করেন ফ্রান্সের সঙ্গে। ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাশিয়ার যুদ্ধ 'সেডানের যুদ্ধ' নামে পরিচিত (১৮৭০ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত

হওয়ায় দক্ষিণ জার্মানি প্রাশিয়ার পতাকাতলে সমবেত হয়। তার ফলে জার্মানির ঐক্যসাধনও সম্পূর্ণ হয়। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রাশিয়ার সম্রাট ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সম্রাটরূপে ঘোষিত হন।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ : মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রাচীন যুগ থেকে দাস-প্রথা চলে আসছে। কিন্তু এই প্রথা ক্রমে অচল হয়ে পড়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে ইতিহাসের মধ্যযুগে ক্রীতদাস প্রথা লুপ্ত হয়। কিন্তু আধুনিক যুগে পুনরায় ঐ দাসপ্রথা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভৌগোলিক আবিষ্কারের সময় যে নতুন দেশ আবিষ্কৃত হয় সেসব দেশে নানা ধরনের কাজে লোক নিয়োগ করে ঔপনিবেশিক দেশগুলো মুনাফা অর্জন করতে থাকে।

আমেরিকা আবিষ্কারের পরেসেখানে কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনে ইউরোপীয় দাস-ব্যবসায়ীরা প্রচুর পরিমাণে দাস সরবরাহ করতে থাকে। ক্ষেত-খামারের মালিকরা ক্রীতদাসদের ব্যাপক হারে নিয়োগ করে ফসল উৎপন্ন করে প্রচুর লাভবান হতে থাকে। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের আগে দেখা যায় কয়েক লক্ষ নিগ্রোকে আফ্রিকা থেকে ধরে নিয়ে আমেরিকায় চালান দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকায় প্রচলিত দাস ব্যবসার সঙ্গে ক্রীতদাসের করুণ কাহিনী জড়িত। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় হাজার হাজার ক্রীতদাসকে গাদাগাদি করে জাহাজ বোঝাই করা হ'ত। নিদারুণ কষ্টে আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় পেঁছানোর পরে দাসদের প্রকাশ্য বাজারে পশুর মত বিক্রী করা হ'ত। মালিকদের ক্ষেত-খামার ও বাড়ীতে তারপর অমানুষিক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তাদের দিন যাপন করতে হত। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এই অমানুষিক দাসপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত হতে থাকে। ইংলণ্ডের উইলবারফোর্স ও গ্রেভিল সার্প-এর নাম দাস-মুক্তির ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই ইংলণ্ডে আইন করে দাসপ্রথাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ইংলণ্ডের মত আমেরিকার মানবহিতৈষী মানুষের মধ্যে ঘৃণ্য দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি উঠতে থাকে। এই প্রসঙ্গে যেসব পুস্তক অপরাপর জনমত সৃষ্টিকারী প্রচার-পত্র প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব থেকে সাধারণ আমেরিকাবাসী দাসদের প্রতি যে অন্যায়-অবিচার করা হ'ত তার কথা জানতে পারে। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে

মিসেস্ হ্যারিয়েট্ বিচার স্টো নামে জনৈক লেখিকা 'আঙ্কল টমস্ কেবিন' নামে একখানি পুস্তকে দাসদের প্রতি খামার মালিক ও অপরাপর দাস-মালিকদের অত্যাচার এবং দাসদের মর্মান্তিক অবস্থার কথা প্রকাশ করেছিলেন। এই সূত্রে দাসপ্রথা-বিরোধী এক তুমুল আন্দোলন আমেরিকায় শুরু হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাস-ব্যবসায় ও দাসবিলুপ্তিকে কেন্দ্র করে উত্তর আমেরিকা ও আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে এক গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। সেই সময় উত্তরাঞ্চল ছিল শিল্পোন্নত এবং দক্ষিণাঞ্চল ছিল কৃষি-প্রধান। উত্তরাঞ্চলে দাস নিয়োগের সুযোগ প্রায় ছিলই না। কারণ সেখানে কল-কারখানায় স্বাধীন শ্রমিকের প্রয়োজন হ'ত। দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিকাজের জন্য সেখানকার ক্ষেত-খামারের মালিকরা ক্রীতদাস নিয়োগ করত। তুলা ও আখের আবাদের মালিকদের কাছে স্বাধীন শ্রমিক অপেক্ষা ক্রীতদাস নিয়োগ অনেক লাভজনক ছিল। ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে আমিরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল ছিল বেশী তৎপর। সেই কারণে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ, বিশেষতঃ সেখানকার ক্ষেত-খামারের মালিকরা দাস নিয়োগের ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিল। এর দরুন উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে এক গৃহযুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়েছিল।

আব্রাহাম লিঙ্কন ও আমেরিকার গৃহযুদ্ধ : ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাসপ্রথা এক গুরুতর প্রশ্ন হয়ে ওঠে। আব্রাহাম লিঙ্কন নামে আমেরিকাবাসী রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হন। তিনি দাসপ্রথার একজন উগ্র বিরোধী ছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের দাসপ্রথার সমর্থকরা মনে করল যে, তিনি যদি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন তাহলে দাসদের তিনি মুক্তি দেবেন।

যাইহোক, ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে আব্রাহাম লিঙ্কন যখন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন তখন দক্ষিণাঞ্চলের দাসপ্রথার সমর্থক রাজ্যগুলি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক পৃথক রাষ্ট্রসংঘ গঠন করেছিল। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সময় আব্রাহাম লিঙ্কনের যোগ্য নেতৃত্বে আমেরিকা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং আমেরিকার রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষা পেয়েছিল।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যায়।

এই যুদ্ধের প্রথম দিকে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলো উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি দুর্গ অধিকার করে নিয়েছিল। কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন তাতে মোটেই বিচলিত হননি। তিনি দক্ষতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলকে বেকায়দায় ফেলেছিলেন। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে তিনি এক ঘোষণার দ্বারা আমেরিকার যাবতীয় ক্রীতদাসের মুক্তি দেন। তারপর দেখা গেল হাজার হাজার দক্ষিণাঞ্চলের ক্রীতদাস উত্তরাঞ্চলের সৈন্য বাহিনীতে নাম লিখিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়েছে। এর কিছুদিনের মধ্যেই আব্রাহাম লিঙ্কনের সৈন্যদল জয়লাভ করে আমেরিকার ঐক্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়।



আব্রাহাম লিঙ্কন

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে সেখানকার ক্রীতদাসরা মুক্তি পেয়েছিল। তারা স্বাধীন নাগরিকের সব অধিকার ও মর্যাদা লাভের অধিকারী হয়েছিল।



সরকারীভাবে ক্রীতদাসরা স্বাধীন হলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেসরকারী পর্যায়ে

প্রাক্তন নিগ্রো ক্রীতদাসদের ওপর নির্যাতন চলতে থাকে। শ্বেতকায় মানুষেরা নিজেদের মধ্যে সংঘ গঠন করে নিগ্রো দমনে নিযুক্ত ছিল। এই সব দলের মধ্যে 'কু-ক্লাক্স-ক্লান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের বিস্তার ও ফলাফল ঃ শিল্প-বিপ্লব অপেক্ষাকৃত দেরীতে ইংলণ্ড থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দেখা যায় ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিল্প-বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছে।

১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে যন্ত্রপাতি রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। সেখানে প্রস্তুত অনেক যন্ত্রপাতি ইংলণ্ড থেকে বিভিন্ন দেশে আমদানি করে নিজেদের শিল্পোৎপাদন বাড়াতে থাকে। বলা বাহুল্য, সেই সময় থেকে



ফ্রান্স ক্রমাগত যন্ত্রপাতি আমদানি করায় দেশের বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সের খনি, কাপড়কল ও অন্যত্র প্রায় পাঁচ হাজার বাষ্পচালিত যন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। তাছাড়া মাল পরিবহণের জন্য রেলগাড়ী প্রভৃতিও ব্যবহৃত হতে থাকে। কয়লা, লোহা, ইস্পাত, পশম ও সুতী-বস্ত্র প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ফ্রান্সে উৎপন্ন হতে থাকে।

জার্মানিতে ফ্রান্সেরও অনেক পরে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়েছিল। তবে ঐক্যবদ্ধ হবার আগে জার্মানির প্রাশিয়া রাজ্যেই প্রথম শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ঐক্যবদ্ধ হবার পরে অবশ্য জার্মানির সর্বত্র ব্যাপকভাবে শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়েছিল।

ফ্রান্স ও জার্মানির মত ইউরোপের অপরাপর দেশেও দেরিতে অথবা আগে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়েছিল। হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও বেলজিয়ামে শিল্প-বিপ্লব প্রসূত পরিবর্তন অনেক আগেই দেখা দিয়েছিল। ইতালি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়নি।

শিল্প-বিপ্লবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে এক নতুন সামাজিক সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সম্প্রদায় বলতে বোঝায় উচ্চ মধ্যবিত্ত। এরা ধনিক সম্প্রদায়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে যে নতুন নতুন কল-কারখানা গড়ে উঠেছিল এরা তার মালিক। পণ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায় সেগুলি বিক্রী করে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করতেন।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে যে বিশাল শ্রমিক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল তারা ক্রমে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে কলকারখানায় শ্রমিকদের কাজ করানোর মধ্যে যে অমানুষিক পরিশ্রম জড়িত ছিল তার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এই মনোভাব থেকে অনেক শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এইসব শ্রমিক সংগঠন সংঘবদ্ধভাবে নানা ধরনের দাবি জানাতে থাকে এবং আন্দোলনের মাধ্যমে সেসব দাবি পূরণে সমর্থ হয়।

শিল্প-বিপ্লব শিল্পনগরী গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। ইতিপূর্বে যেসব শহর গড়ে উঠেছিল সেগুলো সাধারণতঃ বাণিজ্য-কেন্দ্র অথবা শাসন-কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন তার জায়গায় গড়ে ওঠে শিল্পনগর। এইসব শিল্পনগরীতে কল-কারখানা গড়ে ওঠার ফলে এখানে শ্রমিকদের ভিড় বাড়তে থাকে। এর কুফল হিসাবে শহরগুলো নোংরা ও ঘিঞ্জি হয়ে ওঠে। কারণ শহরগুলোতে পর্যাপ্ত জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় সেগুলি প্রচণ্ড নোংরা হয়েছিল।

ইঞ্জিনীয়ারিং এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক উন্নতি ও প্রয়োগের ফলে জীবন-যাপন হয়ে উঠল সহজসাধ্য ও আরামপ্রদ। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে দেশ থেকে দেশান্তরে দূরত্ব কমে গেল। বিশ্বের অর্থনীতি একই সূত্রে বাঁধা পড়ল। এই নতুন অর্থনীতির ফলে জীবন, চেতনা ও আদর্শেরও পরিবর্তন এল। এই শিল্প বিপ্লবের ফলে জাতীয়তাবাদের শক্তি বৃদ্ধি পেল। গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি পেল। ইউরোপের প্রায় প্রতি দেশেই নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হল। দলীয় ব্যবস্থার বিস্তার ঘটল। যুক্তিবাদ, উদার নীতিবাদ, মানবতাবাদ ও আধুনিক আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রসার ঘটল। ইউরোপের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সৃষ্টির জোয়ার বইল। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেল। ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র থেকে ধর্ম বিচ্ছিন্ন হল।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্টি হয় ধনতন্ত্রবাদ। আরও পরে জন্ম নিল সাম্রাজ্যবাদের। শিল্পোন্নতদেশগুলি এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। এই প্রচেষ্টায় তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বও বৃদ্ধি পেল প্রচণ্ডভাবে।

শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশের সাথে গড়ে উঠল, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও আন্দোলন। শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অভিযোগ একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর চিন্তাও মনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এঁরা এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে রবার্ট আওয়েন, সেণ্ট সাইমন, লুই ব্লঙ্ক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁদের বলা হয় কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্রী কিন্তু সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন কার্ল মার্কস্ ও তাঁর বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্। মার্কস ও এঙ্গেলস্ শুধু দর্শনের সাহায্যে মানব সভ্যতার বিবর্তন ব্যাখ্যাই করলেন না, তাকে পাল্টাবার পথও নির্দেশ করলেন। নতুন সমাজ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র তৈরীর ক্ষেত্রে মার্কস্ শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার ঐতিহাসিক গুরুত্বের উল্লেখ করলেন। তিনি মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস ব্যাখ্যা করে বললেন এই অগ্রগতির পিছনে রয়েছে শোষক ও শোষিত দ্বন্দ্ব। নতুন পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক সমাজেও এই দ্বন্দ্ব রয়েছে। পুঁজিপতি শ্রেণী শ্রমিকের শ্রম শোষণ করেই তারা মুনাফা করে। এই শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের উপর পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন এবং এর

জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এইভাবে সমাজতন্ত্র আসবে এবং আস্তে আস্তে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটবে। মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ শুধু 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো',



কার্ল মার্কস্

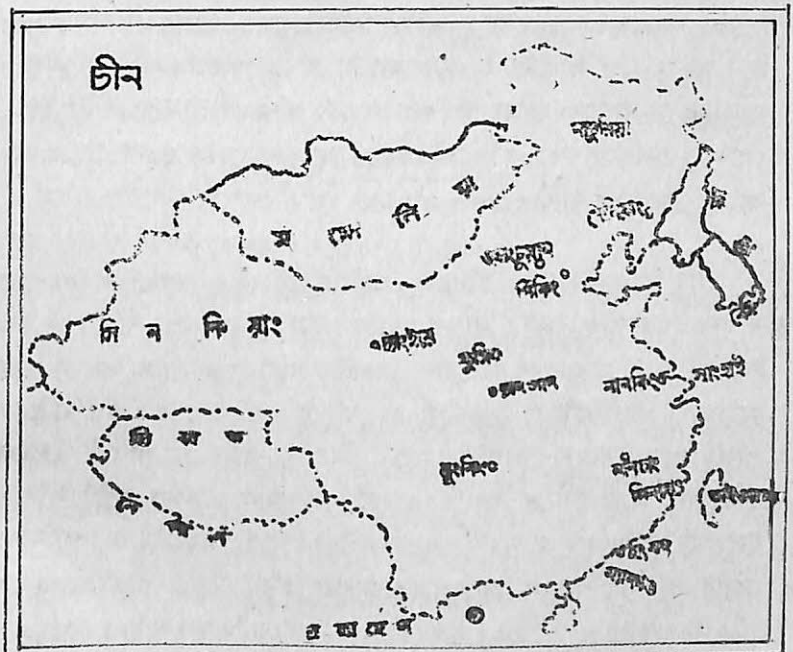


ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্

ডাস ক্যাপিটাল' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে শ্রমিকশ্রেণীর সামনে নতুন সমাজের চিত্র উপস্থিত করেই ক্ষান্ত হননি, শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন তৈরী করতেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চীনদেশের কাহিনী :

ধর্মপ্রচার ও ব্যবসা-বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকরা চীনে উপস্থিত হয়েছিল। এইসব বণিকরা সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য যে জোরদার ভাবে চালাতে পারতো তা নয়। বিদেশী বণিকরা ক্যান্টন ও ম্যাকাও বন্দর থেকেই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। চীনের অপরাপর



জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্যান্টন নামক বন্দরে একটি বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করে চীনে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে থাকে। ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের মূল উপকরণ ছিল আফিং।

ইংরেজরা আফিংকে চীনাদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য প্রথমে নামমাত্র মূল্যে আফিং বিক্রী করতে থাকে। মাদক জাতীয় দ্রব্য বলে চীনারা

সহজেই আফিং-এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। চীনাদের মধ্যে আফিং-এর চাহিদা যখন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকল তখন ইংরেজ ব্যবসায়ীরা আফিং-এর দাম বহুগুণ বৃদ্ধি করে প্রচুর মুনাফা করতে লাগল। আফিং-এর নেশা যত বাড়তে লাগল আফিং-এর ব্যবসা ততই বেড়ে চলল।

চীনদেশের তদানীন্তন মাঞ্চু সম্রাট চীনাদের উপর আফিং-এর প্রভাব দূর করবার জন্য ঐ ব্যবসায়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা আফিং ব্যবসায়ীদের টলাতে পারেনি। তারা চোরা পথে আফিং চালান দিয়ে প্রচুর লাভ করতে লাগল। অতঃপর মাঞ্চু সম্রাটের নির্দেশে সরকারী কর্মচারীরা আফিং-এর চোরা চালান বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। এইসব বিধিব্যবস্থাতেও কোন কাজ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত মাঞ্চু সম্রাটের সৈন্যরা ক্যাণ্টন বন্দর অবরোধ করে প্রায় বিশ হাজার বাক্স আফিং বাজেয়াপ্ত করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে। এই ঘটনা থেকে ইংরেজদের সঙ্গে চীন সম্রাটের যে যুদ্ধ শুরু হয় তা 'অহিফেন' বা আফিং যুদ্ধ নামে খ্যাত (১৮৩৯ খ্রীঃ)।

প্রথম অহিফেন যুদ্ধে চীনাদের পরাজয় হয়েছিল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজরা সহজেই চীনাদের পরাজিত করতে সমর্থ হয়। শুধু তাই নয়, ইংরেজরা নানকিং আক্রমণ করে মাঞ্চু সম্রাটকে নানকিং-এর সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করেছিল (১৮৪২ খ্রীঃ)। নানকিং-এর সন্ধির সর্ত অনুসারে দক্ষিণ-চীনের পাঁচটি বন্দর, যেমন—ক্যাণ্টন, ফুচো, নিংপো, আময় ও সাংহাই ইংরেজ বণিকদের কাছে উন্মুক্ত করা হয়। চীন উপকূলে অবস্থিত হংকং দ্বীপটি ইংরেজদের অধিকারে আসে। তাছাড়া এইসব বন্দরে আমদানী ও রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ওপর পাঁচ শতাংশ হারে শুল্ক আদায়ে চীনা সরকার রাজী হয়েছিল। চীন সরকার এই সময় থেকে ইংরেজদের সমান মর্যাদা দিতেও স্বীকৃত হয়েছিল। নানকিং-এর সন্ধির দ্বারা ইংরেজরাই কেবল লাভবান হয়নি, অপরাপর দেশের বণিকরাও চীনা সরকারের কাছ থেকে নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছিল।

নানকিং-এর সন্ধি বিদেশী দেশসমূহের চীনদেশে আধিপত্য বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপমাত্র বলা যেতে পারে। কারণ ঐ ঘটনার অল্পদিনের মধ্যেই পুনরায় বিদেশীদের সঙ্গে চীনাদের বিবাদ শুরু হয় এবং তা থেকে বেধে যায় যুদ্ধ।

বিদেশী বণিকরা চীনা সম্রাটের উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা

বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছিল। কিন্তু চীনা সম্রাট তাতে রাজী না হওয়ায় যুদ্ধের মাধ্যমে বিদেশীরা তাদের দাবি আদায়ের পন্থা অবলম্বন করেছিল। এই সূত্রে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তা দ্বিতীয় 'অহিফেন যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের অজুহাত বের করতে বিদেশীদের কোন অসুবিধা হয়নি। এ্যারো নামে একটি ব্রিটিশ পতাকাধারী জাহাজকে চীনা সরকার আটক করে। এই আটক করার পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। আইনভঙ্গের অপরাধেই জাহাজটিকে আটক করা হয়। এতে ইংরেজ বণিকরা চীন সম্রাটের বিরুদ্ধে ইংরেজ জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ এনে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে ফরাসীরাও চীনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। কারণ চীনদেশে কয়েকজন ফরাসী ধর্মযাজককে হত্যা করা হয়েছিল। এই সব কারণ দেখিয়ে ইংরেজ ও ফরাসীরা যুগ্মভাবে চীন সম্রাটের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করে তা 'দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ' নামে খ্যাত (১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)। ?

দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধেও চীনা সৈন্যরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় মাঞ্চু সরকার টিয়েনসিন-এর সন্ধি সাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই নতুন সন্ধির শর্তানুসারে বিদেশী বণিকরা আরও এগারোটি বন্দরে বাণিজ্য করাবার অধিকার লাভ করে। তাছাড়া চীন সরকার বিদেশী বণিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রভূত পরিমাণ অর্থ দিতে স্বীকৃত হন।

অল্পদিনের মধ্যে অপর একটি চুক্তি অনুসারে বিদেশী বণিকরা চীনা সরকারের কাছ থেকে 'অতিরাষ্ট্রিক অধিকার' আদায় করেছিল, যার অর্থ হ'ল, বিদেশী অপরাধীদের বিচার চীনদেশের আইন অনুযায়ী হবে না।

ইতিমধ্যে জাপান একটি শক্তিশালী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করায় সে চীনদেশের ওপরই প্রথম তার সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়েছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধে চীন পরাজিত হবার পরে শুরু হয় চীনের ওপর সাম্রাজ্যবাদের নতুন আক্রমণ। এই নতুন সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য ছিল চীনের বিভিন্ন অংশে ইউরোপীয় শক্তিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। এক এক অংশে ইউরোপীয় শক্তিরা নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন করতে থাকে। তরমুজকে ফালি ফালি করে যেমন কাটা হয় তেমনি চীনের এক একটি অংশে এক একটি দেশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব স্যার জন হে তাঁর 'উন্মুক্ত দ্বার' নীতির সাহায্যে চীন দেশের বন্দরগুলিতে

অন্যান্য ইউরোপীয়দের ন্যায় আমেরিকাও ব্যবসা-বাণিজ্যের সমান সুযোগ-সুবিধা দাবি করেন (১৮৯৯ খ্রীঃ)।

সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনাদের অন্তর্বিপ্লব ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনদেশে তাইপিং বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। 'তাইপিং' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'পবিত্র রাজ্য'। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হুং সিউ চুয়ান।

বিদেশীদের হাতে চীনাদের ক্রমাগত পরাজয়ের গ্লানি চীনারা আর সহ্য করতে পারছিল না। তার ওপর আবার আলোচ্য সময়ে চীনদেশে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল চরম দুর্দশা। এই দুই ধরনের অসন্তোষ চীনাদের মধ্যে যে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তাইপিং বিদ্রোহ তারই অভিব্যক্তি বলা যেতে পারে। 'তাইপিং' বিদ্রোহ প্রথম থেকেই একটা রাজনৈতিক বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করেনি। ধর্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পণ্ডিত হুং সিউ চুয়ান একটি নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর খ্রীস্টানধর্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। যাই হোক, চীনদেশের সাধারণ মানুষের মনে এই নতুন ধর্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। চীনের শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর সাধারণ মানুষ এতে যোগদান করবার ফলে তাইপিং বিদ্রোহ এক গণ-বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করেছিল।

মাঞ্চু সরকার তাইপিং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর চরম নির্যাতন শুরু করবার ফলে বিদ্রোহীরা রাজনৈতিক বিদ্রোহ শুরু করেছিল। তাইপিং বিদ্রোহীরা এক বিশাল সেনাদল গঠন করে মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। মাঞ্চু সরকারকে উচ্ছেদ করে চীনদেশে 'পবিত্র রাজ্য' অর্থাৎ তাইপিং প্রতিষ্ঠা করা বিদ্রোহীদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। চীনদেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাইপিং বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহীরা এমনকি নানকিং দখল করে সেখানে তাইপিং শাসনব্যবস্থা কায়েম করতেও সমর্থ হয়েছিল।

মাঞ্চু সরকারের সেনাদল তাইপিং বিদ্রোহীদের ওপর চরম আঘাত হেনেছিল। এই ব্যাপারে মাঞ্চু সরকার বিদেশী বণিকদের সহযোগিতালাভে সমর্থ হয়েছিল। কারণ বিদেশীদের উপর আক্রমণ চালানো তাইপিং বিদ্রোহীদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাইপিং বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করেনি। তাইপিং বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে চীনা সরকারের প্রভূত সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছিল। তাছাড়া দেশের সর্বত্র বিদ্রোহ চলবার ফলে রাজস্ব আদায়ও অনেকখানি কমে গিয়েছিল।

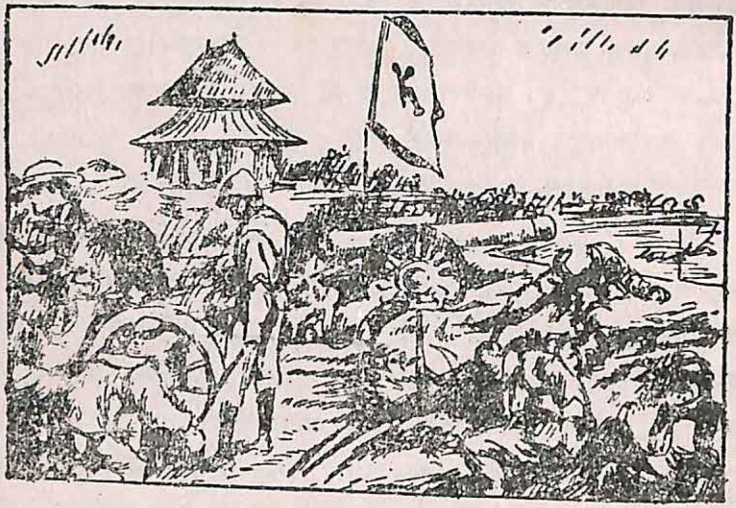
তাইপিং বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এই সময় থেকে মাঞ্চু সরকারের দুর্বলতাগুলি জনসাধারণের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চীনদেশের এক শ্রেণীর মানুষ ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে থাকে যে, নতুন সংস্কারের মাধ্যমে দেশকে পুনর্গঠিত করতে না পারলে চীনদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় ক্যাং হুই ওয়াই নামে জনৈক চীনা দেশপ্রেমিক তদানীন্তন মাঞ্চু সম্রাটের কাছে এই মর্মে একখানি স্মারকলিপি পেশ করেন যে, চীনদেশের শাসনব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, সুতরাং উপযুক্ত সংস্কারের মাধ্যমে দেশের পুনরুজ্জীবন ঘটানো একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সম্রাট কোয়াং সু এই স্মারকলিপির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নানা আদেশনামার মাধ্যমে নতুন নতুন সংস্কারের প্রবর্তন করেন। এই সংস্কারগুলি সাধারণভাবে 'একশত দিনের সংস্কার' নামে অভিহিত।

একশত দিবসের সংস্কারের মূল কথা ছিল এই রকম—সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে কেবল দক্ষতা ও কর্মকুশলতাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জনসাধারণের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ ঘটানোর জন্য জাতীয়-সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার সম্প্রসারণ ব্যতীত দেশের উন্নতি সম্ভব নয় এবং তার জন্য আধুনিক ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। আইন-ব্যবস্থাকে নতুনভাবে সাজাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক কায়দায় গড়ে তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিতে হবে।

একশত দিবসের সংস্কারের মাধ্যমে চীনদেশের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর যে চেষ্টা চলছিল দেশের রক্ষণশীলদের বিরোধিতার দরুন তা সম্ভবপর হয়নি। রক্ষণশীল চীনারা এর বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাবার ফলে শেষ পর্যন্ত বিধবা সম্রাজ্ঞী জু-সি নিজের হাতে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁর দত্তক পুত্র কোয়াং সু-কে পদচ্যুত করবার পরে তিনি প্রথমেই নতুন সংস্কারগুলি প্রত্যাহার করে নেন।

একশত দিবসের সংস্কারের ব্যর্থতার পরবর্তী পর্যায়ে বক্সার বিদ্রোহ চীনদেশের ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। চীন-জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের পরে চীনদেশ ক্রমাগত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হতে থাকে। এমতাবস্থায় চীনদেশের সর্বত্র গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসসৃষ্টির মাধ্যমে বিদেশীদের প্রতিরোধ ও মাঞ্চু বংশের উচ্ছেদ করা। এইসব গুপ্ত-সমিতির মধ্যে 'বক্সার' দল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দলের সদস্যরা মুষ্টি যুদ্ধ শিক্ষা করতো বলে এই নামকরণ।

বক্সাররা অপদার্থ মাঞ্চু বংশের উচ্ছেদ সাধন করে এবং বিদেশীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে নতুন চীনদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে বিপ্লবান্দোলন শুরু করেছিল। প্রথম দিকে সাম্রাজ্ঞী জু-সি-বক্সারদের বিরোধিতা করলেও অল্পদিনের মধ্যে তিনি কৌশলে তাদেরকে বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এতে বক্সার বিদ্রোহীরা বিদেশীদের ওপর আক্রমণ তীব্র করে তোলে। বিদেশী



বক্সার বিদ্রোহ

বণিকরা বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে নিজেদের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য মাঞ্চু সরকারের উপর নির্ভর না করে নিজেরাই সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আটটি বিদেশী শক্তি মিলিতভাবে সৈন্যসামন্ত নিয়ে বক্সার বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার কাজে লেগে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে বক্সার বিদ্রোহীরা সুবিধা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

বক্সার বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরবর্তীকালে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে সম্রাজ্ঞী স্বয়ং চীনদেশে নতুনভাবে সংস্কার প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সংস্কারও তেমন কার্যকর হয়নি। উপরন্তু অল্পদিনের মধ্যেই জু-সির মৃত্যু হওয়ায় সেই সংস্কারগুলি কার্যত ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে যে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবান্দোলন শুরু হয়, তার ফলেই শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে মাঞ্চু সরকারের উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছিল। ডাঃ সান ইয়াৎ সেন ইওরোপ

ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি চীনাদের জাতীয়তাবাদী আদর্শে দীক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে 'তুং মেং হুই' নামে একটি দল



ডাঃ সান ইয়াৎ সেন

প্রতিষ্ঠা করেন। ডাঃ সান ইয়াৎ সেন স্বয়ং ছিলেন এই দলের সর্বপ্রধান ব্যক্তি। এই দল চীনদেশের সর্বত্র জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার করতে উদ্যোগী হয়েছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে বুঝে তুং মেং হুই দল সরকারী সেনাদলের একাংশকে মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে প্ররোচিত করে। তারপরেই শুরু হয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। দেশের সর্বত্র মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হল। এই সময় ইউয়ান সিকাই নামে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মাঞ্চু সরকার প্রধান সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠা করে বিপ্লবীদের দমনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু ইউয়ান সিকাই বিপ্লবীদের সঙ্গে সমঝোতায় আসেন। ইউয়ান সিকাই-এর নির্দেশে মাঞ্চু সরকার পদত্যাগ করেন এবং ইউয়ান সিকাইকে চীনা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে ঘোষণা করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ডাঃ সান ইয়াৎ সেনকে ইতিপূর্বেই নানকিং-এ অস্থায়ী চীনা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে বিপ্লবীরা নিযুক্ত করেছিল। সান ইয়াৎ সেন পদত্যাগ করায় এখন ইউয়ান সিকাইকে সেই পদে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইভাবে চীনদেশে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল বলা যেতে পারে।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রধান শক্তি হিসাবে জাপানের উত্থান ঃ

চীনদেশের মত জাপানেও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবলিত হয়েছিল। কিন্তু জাপানীরা অল্পদিনের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে দেশকে পুনর্গঠিত করতে না পারলে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হবে না। ইতিমধ্যে জাপানের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও ঘটে গিয়েছিল তা হ'ল 'সম্রাটের পুনরাগমন'।

জাপান দীর্ঘদিন ধরে সামন্ত প্রভু সোগানের অধীনস্থ ছিল। 'মিকাডো' বা সম্রাটের ক্ষমতাকে সোগান কুক্ষিগত করে রেখেছিল। জাপানে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের জন্য জাপানীরা প্রধানতঃ সোগানকেই দায়ী করেছিল। জাপানীদের ধারণা হয়েছিল যে, সোগানদের অযোগ্যতার জন্যই দেশে বিদেশীরা সাফল্য লাভ করেছে। এমতাবস্থায় জাপানীরা দাবি



জানাতে থাকে যে, 'মিকাডো'-কে তার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এই আন্দোলনের ফলে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'মিকাডো' তাঁর ক্ষমতা ফিরে পান। এই ঘটনা 'মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা' নামে খ্যাত। সম্রাট মুৎসোহিতো ঐ বছর সম্রাট হিসাবে জাপানের শাসন কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করেন।

সম্রাট মুৎসোহিতো ছিলেন একজন প্রগতিশীল সম্রাট। তিনি জাপানকে আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে গড়ে তোলার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় তিনি জাপানী ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রেরণ করেন, যাতে সেখানকার আধুনিক রীতিনীতি সম্পর্কে তারা অবহিত হতে পারে। জাপানের শাসনতন্ত্রকে প্রাশিয়ার আদর্শে রচনা করা হয়। দেশের আইন-কানুনের আধুনিকীকরণ করা হয়। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণকে আবশ্যিক বলে ঘোষণা করে শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রের উদ্যোগে দেশের সর্বত্র কারিগরী বিদ্যালয়, সাধারণ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইংরেজী ভাষাকে আবশ্যিকভাবে পাঠ্য করা হয়। দেশের সামরিক বাহিনীকে আধুনিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে জল ও স্থলবাহিনীকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান হয়। জাপানের পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়। শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে দেশের সর্বত্র কল-কারখানা গড়ে তোলা হয়। এইভাবে বলা যেতে পারে যে, সর্বক্ষেত্রে সংস্কারের প্রবর্তন করায় জাপান এক আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল।



মুৎসোহিতো

জাপানের সাম্রাজ্য লিপ্সা :—পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণের মাধ্যমে জাপান কেবল উন্নত রাষ্ট্রেই পরিণত হয়নি, সে পাশ্চাত্য দেশগুলোর মত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করেছিল। জাপান সর্বপ্রথম তার দুর্বল প্রতিবেশী চীনদেশের উপর তার সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা পূরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে জাপান চীনদেশের ওপর আক্রমণ চালায়। চীনের নিকট-বর্তী কোরিয়াকে কেন্দ্র করেই চীন-জাপান যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। কোরিয়ার উপর দীর্ঘদিন ধরে চীন তার অধিরাজতন্ত্র বা প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। প্রথম দিকে জাপান কুটনৈতিক চালের দ্বারা কোরিয়ায় চীনের সঙ্গে সমান

মর্যাদা লাভের চেষ্টা করে। এতে তেমন সুবিধে না হওয়ায় জাপান কোরিয়ায় তার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিল। জাপানের অজুহাত ছিল এই যে, চীন জাপানের অনুমতি ব্যতীত কেন কোরিয়ায় তার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছে। যাই হোক, চীন-জাপান যুদ্ধে দুর্বল চীন জাপানের কাছে পরাজিত হয়ে শিমনোশেকির সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয় (১৮৯৫ খ্রীঃ)। এই সন্ধির সর্তানুসারে চীন কোরিয়ার ওপর তার আধিপত্য বিসর্জন দিয়েছিল। তাছাড়া চীন জাপানকে মাঞ্চুরিয়া, লিয়াও টুং ও পোর্ট আর্থার ছেড়ে দিয়েছিল।

চীন-জাপানের যুদ্ধে জাপানের জয়লাভের ফলে তার আন্তর্জাতিক মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে জাপান রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে রাশিয়ার অগ্রগতি জাপানের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে জাপান ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদন করে তার মর্যাদাকে আরও অনেকখানি বাড়াতে সমর্থ হয় (১৯০২ খ্রীঃ)।

শিমনোশেকির সন্ধির দ্বারা জাপান মাঞ্চুরিয়ার ওপর আধিপত্য স্থাপনের সুযোগ লাভ করলে রাশিয়া তাতে বাধা দিয়েছিল। এতে জাপান রাশিয়ার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ইতিমধ্যে চীনদেশে বক্সার বিদ্রোহের সময় যে সব রুশ সৈন্য সেখানে পাঠানো হয়েছিল তাদের অনেককে মাঞ্চুরিয়া থেকে আর ফিরিয়ে আনা হয়নি। জাপান এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, কিন্তু রাশিয়া তাতে কর্ণপাত করেনি। মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তার জাপানীদের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। এমতাবস্থায় নবশক্তিতে জাগ্রত জাপান রাশিয়াকে চরম শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে আক্রমণ করে বসে এবং অল্প সময়েই রাশিয়াকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার সঙ্গে জাপান যে পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি স্বাক্ষর করে তার দ্বারা জাপান পোর্ট আর্থার বন্দর, শাখালিনের দক্ষিণাংশ প্রভৃতি লাভ করেছিল। জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় সমস্ত বিশ্বকে বিস্মিত করেছিল। জাপান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ হয়। এই সময় থেকে জাপান নিজ শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়েছিল। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে জাপান কোরিয়ার স্বাধীনতা বিলুপ্ত করে তাকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়। এই ঘটনার অল্পদিনের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাপান দুর্বল চীনের ওপর 'একুশ দফা দাবি' জানিয়েছিল।

আলোচ্য সময়ে চীনদেশ এতই দুর্বল ছিল যে, জাপানের দাবিগুলির বিরোধিতা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই একুশদফা দাবির মূল কথা ছিল সামটুং ও জার্মান-অধিকৃত স্থানগুলি জাপানের প্রভাবাধীন থাকবে। পোর্ট আর্থার ও ডায়রস—এই দুটি জায়গা ৯৯ বছরের ইজারায় জাপানকে দিতে হবে। চীন দেশের হ্যানিয়েপিং নগরের বৃহৎ লোহার কারখানাটি চীন ও জাপানের যৌথ পরিচালনাধীনে স্থাপন করতে হবে। চীন কোন বন্দর বা দ্বীপ তৃতীয় শক্তিকে বিক্রী বা হস্তান্তর করতে পারবে না। তাছাড়া এমন অনেক শর্তও ছিল যার মাধ্যমে জাপান ও চীনদেশের ওপর নিজ স্বার্থ ও প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

চীনদেশের তদানীন্তন জাতীয়তাবাদী নেতারা এইসব দাবির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও জাপান এইসব দাবি বহাল রেখেছিল। চীনদেশ কর্তৃক একুশ দফা দাবি মেনে নেবার অর্থ ছিল চীনদেশকে জাপানের অধীনস্থ করা।

———

১১ সিপাহী যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষ

নতুন শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপঃ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ করে তার দ্বারা ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তিত হয়। ইতিপূর্বে কোম্পানির ডিরেক্টর-সভা ও বোর্ড অফ কণ্ট্রোল যেসব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাদের সেইসব ক্ষমতা এখন দেওয়া হয় ইংলণ্ডের একজন মন্ত্রীকে। এই মন্ত্রীর নাম হয় 'ভারত সচিব'।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতীয় প্রজাদের আশ্বস্ত করবার জন্য এক ঘোষণাপত্র জারী করেন। এই ঘোষণাপত্র 'মহারাণীর ঘোষণা' নামে পরিচিত। মহারাণীর ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল যে, ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের দেশীয়, রাজগণের সঙ্গে যেসব চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছে সেইগুলোর যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে। মহারাণী তাঁর ঘোষণায় বলেছিলেন যে, এতদিন ধরে ইংরেজরা এদেশে যে রাজ্যজয় নীতি গ্রহণ করেছিল তা পরিত্যক্ত হ'ল। ভারতবাসীদের যোগ্যতা অনুসারে উচ্চ-রাজপদে নিযুক্ত হতে আর কোন বাধা থাকবে না। এক কথায় বলতে গেলে, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনের দ্বারা ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন করা হয়নি। ভারতের গভর্ণর জেনারেল 'ভাইসরয়' নামে নতুন উপাধি লাভ করেন।



মহারাণী ভিক্টোরিয়া

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের পরবর্তীকালে একের পর এক আইন পাস করে ইংরেজ সরকার ভারত শাসনের ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্তন সাধন করেছিলেন।

ভারতে ইংরেজ সরকারের অনুসৃত বৈদেশিক নীতিঃ—সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের পর লর্ড ক্যানিং ভারতের আভ্যন্তরীণ শাসনকাজে মনোনিবেশ করেন।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের সীমান্ত অঞ্চলে কতকগুলি জরুরী প্রয়োজনে ইংরেজ সরকার এক আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।



লর্ড ক্যানিং

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ নতুন করে আবার ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। রাশিয়া ও ফ্রান্স যথাক্রমে মধ্য-এশিয়া ও পূর্ব-এশিয়ায় একের পর এক রাজ্য গ্রাস করতে থাকলে ইংরেজ সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ইউরোপের কোন দেশের প্রভাব যাতে ভারত-সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ণ করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার আগে থেকেই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত রাজ্যগুলোর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে অথবা প্রয়োজনবোধে সংঘর্ষের দ্বারা ঐগুলিকে পদানত করতে উদ্যোগী হয়েছিল।

ভারত ও আফগানিস্তান ঃ আলোচ্য সময়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। উপরন্তু রাশিয়া মধ্য এশিয়ায় বিস্তার নীতি অনুসরণ করবার দরুন ইংরেজ সরকার আশঙ্কা করছিল যে, রাশিয়া আফগানিস্তানের মধ্য দিয়া যে-কোন সময় ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এমতাবস্থায় আফগানিস্তানে রুশ প্রভাবকে প্রতিহত করা ইংরেজ সরকারের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।



লর্ড রিপন

দীর্ঘদিন ধরেই আফগানিস্তানের প্রতি ইংরেজ সরকার খুবই কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে লর্ড লিটন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 'গণ্ডামকের

সন্ধির দ্বারা উভয়পক্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও তা ছিল একেবারে সাময়িক। লর্ড লিটনের পরবর্তী বড়লাট লর্ড রিপন আফগানিস্তানের প্রতি শান্তিপূর্ণ নীতি অবলম্বন করেছিলেন যার ফলে সেই দেশের আমীরের সঙ্গে ইংরেজদের একটা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমীরের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির মাধ্যমে ইংরেজ সরকার আমীরকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষার এবং বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা ভাতা হিসাবে দানে সম্মত হয়েছিল।

ভারত ও ভুটান ঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকেই পর্বত-সংকুল দেশ ভুটানের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে ডুয়ার্স অঞ্চলকে ভুটানবাসীদের লুঠতরাজ থেকে মুক্ত রাখবার জন্য ইংরেজ সরকার এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। কিন্তু তাতে কোন কাজ না হওয়ায় ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ সরকার ডুয়ার্স অধিকার করে এবং ভুটানের বৈদেশিক নীতি পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করে।

ভারত ও তিব্বত ঃ এশিয়ায় রুশ-প্রভাবকে প্রতিহত করবার জন্য ইংরেজ সরকার তিব্বতের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তিব্বতের দলাই লামা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরেজদের হস্তক্ষেপকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় যার ফলে উভয়ে তিব্বতের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতে স্বীকৃত হয়েছিল।

ভারত ও ব্রহ্মদেশ ঃ ভারত-সাম্রাজ্যের অনতিদূরে ব্রহ্মদেশ ফরাসী প্রাধান্য প্রতিহত করবার জন্য ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ দখল করে নিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফরাসী অগ্রগতি ইংরেজদের ভারত-সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। 'বোম্বাই-বর্মা' বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের অজুহাতে ভারত সরকার ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করে। তদানীন্তন ব্রহ্মরাজ থিবো সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেননি। এই যুদ্ধ জয়লাভের ফলে ব্রহ্মদেশ ইংরেজদের ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার আভ্যন্তরীণ বিস্তারনীতিকে বর্জন করে সাম্রাজ্য-বাদ বিস্তারনীতি গ্রহণ করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কার ঃ উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা হ'ল সমাজ-সংস্কারের উদ্যোগ। সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারতীয় মনীষী ও ভারত-হিতৈষী ইংরেজদের মনে উদিত হয়েছিল। কোম্পানির সরকার আইন ও প্রশাসনের

মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধন করেছিল। এই ব্যাপারে যেসব ভারতীয় উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের নাম সবার আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন এক তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে এই মর্মে আইন পাশ করা হয় যে, বিধবা-বিবাহ সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ। তা সত্ত্বেও বিধবাদের পুনর্বিবাহ সমাজে তেমন স্বীকৃতি পায়নি।



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ভারতবর্ষে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে ব্রাহ্ম-আন্দোলন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজ পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের মাধ্যমে তিনি দেশবাসীকে কুসংস্কার মুক্ত হয়ে দেশ গঠনের কাজে মনোনিবেশ করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভূমির কল্যাণ সাধন করা। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ার দরুন তিনি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে' একটি নতুন সংগঠন স্থাপন করেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ব্যতীত সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঐ সংগঠনের শাখা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।



রাজা রামমোহন

ব্রাহ্ম সমাজের মত বেদ-সমাজ, আর্য সমাজ প্রভৃতিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আলোচ্য সময়ে সমাজ-সংস্কারের কাজে লিপ্ত ছিল।

জাতীয়তাবোধের ক্রমবিকাশ :

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখেছিল। ভারতীয়রা ক্রমে কুসংস্কারমুক্ত হয়ে

নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, শক্তি-সামর্থ্য এবং অতীত ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে। ভারতবাসী এক শক্তিশালী জাতি হিসাবে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

ভারতীয়দের এক শক্তিশালী জাতি হিসাবে সুসংবদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তা রাজা রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি সঠিক-ভাবে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, দেশবাসীর অজ্ঞতা, মূর্খতা ও বিচ্ছিন্নতা দূর করে সমগ্র ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে তবেই বিদেশী অপশাসন ও সেই অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব হবে।

রামমোহন রায়ের পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতবাসীকে দেশপ্রেমের এক নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই দেশভক্তিকে তিনি ভারতবাসীর উন্নতির একমাত্র উপায় বলে বর্ণনা করেছেন তাঁর একাধিক গ্রন্থে। স্বামী বিবেকানন্দের সব রকমের কুসংস্কার-বর্জিত সমাজের আদর্শ ও দেশবাসীকে গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল।


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সমসাময়িক বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারার প্রভাবে ভারতীয়রা ক্রমশঃ বুঝতে পেরেছিল যে তাদের জীবনের সব রকমের অধঃপতনের জন্য একমাত্র বিদেশী অপশাসনই দায়ী। এই ধারনা বদ্ধমূল হয়ে উঠবার ফলে ভারতবাসীর মধ্যে জন্ম নিয়েছিল এমন এক আদর্শ যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বদেশ-প্রীতি ও স্বদেশ-চেতনা। এই চেতনা ভারতীয়দের ইংরেজ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন শুরু করবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

ভারতীয়দের গভীর জাতীয়তাবাদী প্রেরণা জন্ম নিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত নানা প্রকার দমনমূলক নীতির মধ্য থেকেও। ইংরেজ শাসকরা ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সমর্থ হননি বরঞ্চ ক্রমাগত দমনমূলক নীতি গ্রহণ করবার ফলে ভারতবাসীর অসন্তোষের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের নানাবিধ দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে সংবাদপত্রগুলি সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। সেই সময় জাতীয় নেতৃবৃন্দের উৎসাহে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি তীব্র ভাষায় সরকারী নীতির সমালোচনা শুরু করলে ব্রিটিশ শাসনের নগ্ন রূপটি ভারতবাসীর সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমসাময়িক বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীও ভারতীয়দের মধ্যে গভীর জাতীয়তাবাদী প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতালি ও জার্মানবাসীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাহায্য এবং ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছিল।

জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে এদেশে গড়ে উঠে ছিল রাজনৈতিক সংগঠন। এই সব সংগঠনের মাধ্যমে ক্রমে ভারতবাসী ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াইয়ে নামতে পেরেছিল। ১৮৩৮ খ্রীস্টব্দের ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে শুরু করে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠন পর্যন্ত অনেকগুলো রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপিত হয়েছিল যেগুলোর মাধ্যমে ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইংরেজ সরকারের নানাবিধ দোষ-ত্রুটি তুলে ধরেছিলেন।

কিন্তু এই সংগঠনগুলির চরিত্র ছিল মূলতঃ আঞ্চলিক। ক্রমশঃ ভারতীয় নেতৃবর্গ একথা উপলব্ধি করলেন, এক সর্বভারতীয় সংগঠন ছাড়া ভারতীয়দের দাবিগুলি ইংরেজদের কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব নয়। স্বভাবতঃই এক সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করেন অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম নামে একজন ইংরেজ সরকারী কর্মচারী।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহূত হয়েছিল। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল দেশের বিভিন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব দেশসেবকরা কাজ করেছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, ইংরেজ সরকারের কাছে দেশবাসীর সামান্যতম দাবিগুলি তুলে ধরা ইত্যাদি।


উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চরমপন্থী আন্দোলন ঃ

ইংরেজ সরকার প্রথমদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়েছিল।

বাস্তবিক পক্ষে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরিন হিউমকে জাতীয় কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তুলতে উৎসাহিতও করেছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে থাকে। কংগ্রেস নেতৃবর্গ সভাগুলোর মাধ্যমে যেসব দাবিদাওয়া উত্থাপন করেছিলেন তা ইংরেজ সরকারের মনঃপূত হয়নি। এমতাবস্থায় ইংরেজ সরকার জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন এবং তাদের আবেদন-নিবেদনে কোনোভাবেই সাড়া দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি।

প্রথমদিকে জাতীয় কংগ্রেস নেতারা ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করবার পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে যদি ইংরেজ সরকারের কাছে দাবি-দাওয়া পেশ করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই সরকার সেগুলো মেনে নেবে। কিন্তু তাঁদের এই আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছিল। ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের দাবি-দাওয়াগুলোকে কোনভাবেই আমল দেয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় কংগ্রেসে এক শ্রেণীর মানুষ আবেদন-নিবেদনের নীতির প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। শেষোক্ত ব্যক্তিরা 'চরমপন্থী' নামে অভিহিত হন। প্রথমোক্ত নেতৃবর্গ যাঁরা আবেদন-নিবেদনের পন্থায় তখনও অবিচল আনুগত্য রেখে চলছিলেন তাঁরা 'নরমপন্থী' নামে পরিচিত হন।

বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল



বালগঙ্গাধর তিলক



বিপিনচন্দ্র পাল

প্রভৃতি ছিলেন 'চরমপন্থী'। তাঁরা ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে

বিদেশী শাসনমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে 'নরমপন্থী' ও 'চরমপন্থী'দের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠেছিল। চরমপন্থীরা ইংরেজ শাসকদের প্রতি যেভাবে বিষোদ্গার করছিলেন তাতে শঙ্কিত হয়ে ইংরেজরা নরমপন্থীদের কাছে টানবার নীতি গ্রহণ করে। নতুন শাসন-আইন প্রণয়ন করে শাসন ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধনও করা হয়। এইভাবে শাসন-সংস্কারের মাধ্যমে নরমপন্থীদের শান্ত করা সাময়িকভাবে সম্ভব হলেও চরমপন্থীদের তা কোনভাবেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এই সময় থেকে চরমপন্থীদের ওপর সরকারী নির্যাতন চরমভাবে চলতে থাকায় তাদের নেতৃত্বে উগ্রপন্থী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে অনেকগুলি বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতি গড়ে উঠেছিল। এইসব বিপ্লবী সমিতির সদস্যরা সন্ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা বিদেশী অপশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে 'যুগান্তর দল' বাংলায় সর্বত্র সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে ইংরেজ শাসকদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী প্রভৃতি তরুণ কয়েকজন ইংরেজ শাসকদের হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁদের বৈপ্লবিক সন্ত্রাসকার্য ব্যর্থ হলেও ইংরেজ শাসকদের মনে তা নিঃসন্দেহে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল।



ক্ষুদিরাম বসু

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে 'বাঘা-যতীন' জার্মানি থেকে অস্ত্র যোগাড় করে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন। বাংলাদেশ ব্যতীত মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদীরা যেমন সাভারকার, দাদকে প্রভৃতি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা করেছিলেন। সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তাঁরা তাদের পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করতে পারেননি।

১২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ঃ

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, 'সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড'কে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল (১৯১৪ খ্রীঃ)। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় ইউরোপীয় রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে যে উত্তপ্ত হাওয়া বইছিল তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। 'সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড' কেবল একটি অজুহাত মাত্র।

প্রথমতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইউরোপে যে স্বার্থপর ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিল তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। আপাতদৃষ্টিতে শান্তির অন্তরালে চলছিল বিভিন্ন দেশের সমর সজ্জা।

দ্বিতীয়তঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানদের জাতীয়তাবাদ ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব এতই উগ্র হয়ে উঠেছিল যে, সেই দেশ ইউরোপীয় শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। জার্মানির রাজনৈতিক জগৎ থেকে বিসমার্ককে সরানোর পরবর্তীকালে সম্রাট উইলিয়াম যে আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা খুব স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন দেশের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তৃতীয়তঃ, জার্মানি যখন বিশ্বরাজনীতির স্বপ্ন দেখেছিল এবং সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল তখন তা স্বাভাবিকভাবে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের কাছে খুবই আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠল। এমতাবস্থায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া নিজ নিজ নিরাপত্তার জন্য একজোট হয়ে গঠন করল 'ট্রিপল্ আঁতাত'। ইতিপূর্বেই অবশ্য জার্মানি, ইতালি ও অস্ট্রিয়াকে নিয়ে 'ট্রিপল এলায়েন্স'ও গড়ে উঠেছে। এই দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তিজোট খুব স্বাভাবিক কারণেই ইউরোপ তথা বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করেছিল।

চতুর্থতঃ বল্‌কান অঞ্চলে বিভিন্ন দেশ প্রভাব বিস্তারের যে উদ্যোগ নিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটাতে তা বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। জার্মানি, বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ গঠনের জন্য বলকান অঞ্চলে জার্মানি-বিস্তারনীতি

গ্রহণ করেছিল। এই নীতি ইউরোপীয় দেশসমূহ সহজে মেনে নিতে পারেনি। আবার সার্বিয়া অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার আগ্রাসী নীতি রাশিয়ার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, ফ্রান্স জার্মানির কাছ থেকে আলসেস্-লোরেন দখল করতে চাইছিল। কারণ ঐ দুটি প্রদেশ বিসমার্ক সেডানের যুদ্ধের দ্বারা বলপূর্বক অধিকার করেছিলেন। সুতরাং বলা যেতেপারে যে, ইউরোপীয় দেশগুলি উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে রাজ্যগ্রাসের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তা শান্তির পক্ষে মোটেই সহায়ক ছিল না।

পঞ্চমতঃ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন উপরিউক্ত কারণে খুবই অগ্নিগর্ভ অবস্থায় আছে তখন অস্ট্রিয়ার প্রদেশ বস্‌নিয়া'র রাজধানী সেরাজেভো শহরে ভ্রমণরত অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিন্যাণ্ডকে সার্বিয়ার সন্ত্রাসবাদীরা হত্যা করলে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শুরু হয়। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার কাছে এমন কতকগুলি দাবি এই সময় পেশ করেছিল যা মেনে নেওয়া তার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার কাছ থেকে দাবিগুলো আদায় করবার জন্য মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছিল। সেই আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হবার পরে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার ওপর আক্রমণ চালালে একে একে অপরাপর দেশেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। এইভাবেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও ফলাফল :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করেছিল। চার বছর স্থায়ী এই বিশ্বযুদ্ধে হাজার হাজার লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ আহত বা পঙ্গু হয়ে পড়ে। এমন ধ্বংসলীলা ইতিপূর্বে আর কোন যুদ্ধেই লক্ষ্য করা যায়নি। সেইজন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে প্রথম সর্বাত্মক যুদ্ধ বলা হয়ে থকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলে একদিকে যেমন বিশ্ববাসী যুদ্ধের আতঙ্ক সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার জন্যও মানুষ উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল এবং যা থেকে জন্ম নিয়েছিল আন্তর্জাতিক শান্তিসংস্থা 'লীগ অব নেশান্‌স'।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপ অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মান প্রভৃতি সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। এইসব সাম্রাজ্য অবলুণ্ঠিত্র সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিয়েছিল অনেকগুলো ছোট ছোট দেশ। এইসব ছোট ছোট দেশ জন্মলাভ করায় জয় হয়েছিল

জাতীয়তাবাদের। পরাধীন বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরস্পর বোঝা-পড়া করতে চাইলেও বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তিতে স্বাক্ষরিত শান্তি-চুক্তিতে কতকগুলো গুরুতর ত্রুটি থাকার ফলে তা সম্ভব হয়নি। বরঞ্চ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপর একটি বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করেছিল।

বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার কারণ :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের অন্যতম অংশীদার ছিল বৃটেন। তাই এই যুদ্ধে বৃটেনের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসিত ভারতও জড়িয়ে পড়ল। ভারতীয় সম্পদ ও জনবল ব্যবহৃত হল যথেচ্ছভাবে। বার লক্ষেরও বেশী ভারতীয় সৈন্য অংশগ্রহণ করে এই যুদ্ধে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মিত্রপক্ষ এবং বৃটেন এই প্রচার চালায় যে মুক্তি নিয়ে আসাই তাদের লক্ষ্য। এই প্রচার ভারতীয় নেতাদেরও প্রভাবিত করে। তাঁরা ভাবলেন এই সময় বৃটেনকে বিপন্ন করা ঠিক হবে না। এছাড়া প্রথমদিকে ভারতীয় নেতাদের বৃটেনকে সমর্থন ও সাহায্যের পিছনে একটি রাজনৈতিক আশাও ছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন যুদ্ধে বৃটেনকে সমর্থন জানালে ইংরেজরা এদেশে রাজনৈতিক সংস্কার করবে। গান্ধীজি নিজেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন যাতে ভারতীয়রা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়। তাঁর আশা ছিল ইংরেজরা এই সহযোগিতার পরিবর্তে ভারতে স্বরাজের দাবী মেনে নেবে।

অর্থনৈতিক দুর্দশা ও জনসাধারণের অসন্তোষ :

প্রথমদিকে সমর্থন জানালেও শীঘ্রই আশাভঙ্গ হল। ভারতীয় নেতৃবর্গ উপলব্ধি করলেন তাঁদের সমর্থনের পরিবর্তে ইংরেজরা বিশেষ কিছুই দেবে না। যুদ্ধের অর্থনৈতিক কুফলও ইতিমধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। জিনিসপত্রের বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছে প্রচণ্ড গতিতে। এতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। যুদ্ধের প্রথমদিকে ভারতীয় শিল্পপতিরা কিছুটা লাভ করেছিলেন কিন্তু শেষের দিকে তাও বন্ধ হল। শ্রমিকদের মজুরী একদমই বৃদ্ধি পায়নি। উপরন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে কাজের সুযোগও গেল একদম কমে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হল কৃষকদের, কেননা একদিকে খাজনা ও কর বৃদ্ধি অন্যদিকে জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম তাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলল। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিতে থাকল।

ভারতে ও ভারতের বাইরে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ঃ

বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে ভারতীয় বিপ্লবীরা দেশের মধ্যে ও বিদেশে সংগ্রামের যে প্রচেষ্টা চালান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই পর্যায়ের বিপ্লবপ্রচেষ্টা ছিল আরও পরিকল্পিত। বিপ্লবীরা ভারতের বাইরে থেকে অস্ত্র আমদানি করে এদেশে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা করেন; এমনকি সৈন্যবাহিনীকে বিদ্রোহে টেনে আনতে তাঁরা সচেষ্ট হন। ভারতের বাইরে বিপ্লবীদের কার্যক্রম ছিল বিদেশে ভারতীয়দের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলে অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করে স্বদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করা। ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বেশ কয়েকটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। প্রথমে লণ্ডনে সংগঠন গড়ে ওঠে। কিন্তু বিপ্লবী সাভারকার গ্রেপ্তার হলে বিপ্লবীরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। জার্মানীর বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি কেন্দ্র। বিপ্লবারা বৃটেন-জার্মান অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। এখান থেকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দী এবং বিদেশে থাকা ভারতীয় সৈন্যদের দলে টানার চেষ্টা হয়। কাবুলে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দেন পাঞ্জাবের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হরদয়াল। প্রতিষ্ঠিত হয় গদর পার্টি। পাঞ্জাবীদের অনেকে দেশে ফিরে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রাসবিহারী বসু পাঞ্জাব ও বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সমগ্র উত্তর ভারতে বিপ্লব সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অনেকে ধরা পড়লেন এবং ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন। রাসবিহারী বসু পরে জাপানে পালিয়ে যান।

বাংলায় যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডাঃ যদুগোপাল প্রভৃতি বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল জার্মানির কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম চালান। জার্মানি থেকে দুই জাহাজ অস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টার কথা ফাঁস হয়ে যায়। বাঘা যতীন বালেশ্বরের বুড়িবালাম নদীর তীরে চারসঙ্গীসহ বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন।

হোম-রুল আন্দোলন ঃ

তিলক নির্বাসনদণ্ড থেকে ফিরে আসার পর পুনরায় রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে যোগ দিলেন। স্বরাজের দাবী জোরদার হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে ভারত-হিতৈষিণী অ্যানি বেসান্ত আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীদের অনুসরণ করে হোম-রুল

বা স্বরাজ আন্দোলন শুরু করেন। তিলক ও তাঁর হোম-রুল লীগ যোগ দিল এই আন্দোলনে। তিলকের সহজ সরল বক্তৃতায় ও তীক্ষ্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে ও অ্যানি বেসান্তের চেষ্টায় সারা ভারত জুড়ে হোম-রুল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। যুদ্ধের ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে সহজেই এই আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জন করল। মেয়েরাও যোগ দিল এই আন্দোলনে। সরকার শুরু করল নির্যাতন। কিন্তু তাতে আন্দোলন স্তিমিত না হয়ে আরও ছড়িয়ে পড়ল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এল।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি ঃ

হোম-রুল আন্দোলন দেশের মানুষের মধ্যে এক নতুন আবেগ সৃষ্টি করে। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে কংগ্রেসের নরমপন্থী এবং চরমপন্থী সকলেই যোগ দেন। মুসলিম লীগের মধ্যেও এক নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হয় যাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে উদ্যোগী হন। সরকারী নির্যাতনের ফলে তাঁদের এই আগ্রহ আরও বৃদ্ধি হয়। লক্ষ্ণৌ-এ ঠিক এই সময়ই মুসলিম লীগের অধিবেশন চলছিল। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে চুক্তি হয় তা লক্ষ্ণৌ চুক্তি নামে খ্যাত। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে গুরুতর রাজনৈতিক মতভেদ দেখা দিয়েছিল তার একটা আপস-রফা হয়। লীগ কংগ্রেসের স্বায়ত্ত্ব-শাসনের দাবী সমর্থন করে এবং কংগ্রেস লীগের পৃথক নির্বাচনের দাবী সমর্থন করে। এছাড়া লক্ষ্ণৌ-এ কংগ্রেস ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র নিয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে লীগ তা সমর্থন করে এবং সরকারের কাছে তা পেশ করা হয়।

রাওলাট বিল ও জালিয়ানওয়ালাবাগ ঃ

জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী দমননীতির তীব্রতাও বৃদ্ধি পেল। ১৯০৫ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের পর্যালোচনা করে রাওলাট কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন তার উপর ভিত্তি করে রাওলাট আইন তৈরী করা হল। ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হল। এই আইনে বিনা বিচারে আটক করা যেত এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত। বিশেষ বিচারে দণ্ডও দেওয়া যেত। এই রায়ের উপর কোন আপীল করা

চলত না। সারা দেশে অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠল। সমগ্র দেশে হরতাল পালিত হল। পুলিশের গুলিতে অনেকে হতাহত হলেন।

এই তীব্র প্রতিবাদ ও সরকারী নির্যাতনের মধ্যে ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। গভর্নর ও'ডায়ারের অত্যাচারের প্রতিবাদে সারা পাঞ্জাবে



জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ড

অসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠেছিল। দুই নেতা ডাঃ সত্যপাল ও ডঃ সৈফুদ্দিন কিচলু গ্রেপ্তার হলে অবস্থা চরমে ওঠে। সারা পাঞ্জাবে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জেনারেল ও ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক উদ্যানে সমবেত প্রতিবাদী নিরস্ত্র জনতার উপর নৃশংসভাবে গুলি চালিয়ে হাজার হাজার নরনারীকে হতাহত করে। প্রাণদণ্ড, গ্রেপ্তার, বেত্রাঘাত, খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রাখা, সম্পত্তি লুণ্ঠন প্রভৃতি অমানুষিক অত্যাচার চলল অব্যাহতভাবে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন। গান্ধীজি এগিয়ে এলেন প্রতিবাদের পুরোভাগে।

মণ্টফোর্ড সংস্কার প্রস্তাব ঃ

ভারতকে অবিলম্বে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এবং শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে কংগ্রেস-লীগের যুক্ত পরিকল্পনার দাবি সম্পর্কে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের খসড়া প্রস্তাব প্রকাশ করা হল। কেন্দ্রে কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রি-সভার প্রস্তাব থাকল না। স্বভাবতঃই বড়লাটের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভুত রাখার ব্যবস্থাই রইল। কেন্দ্রে দুই কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নিম্নকক্ষে কিছুটা নির্বাচনের ব্যবস্থা হলেও ভোটাধিকার সীমিত রইল। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা

মেনে নেওয়া হল। প্রদেশে দ্বৈত শাসন চালু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু অধিকার দেওয়া হল। অর্থাৎ সংস্কার প্রস্তাবে আসল অর্থনৈতিক এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার মূল বিষয়গুলিই রইল ইংরেজ প্রশাসকদের হাতে। বোঝা গেল ভারেতে স্বরাজের দাবী মেনে নিয়ে শাসন-সংস্কারে ইংরেজরা সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।

মুসলমান জনসাধারণের অসন্তোষ ঃ

ভারতের মুসলিম জনসাধারণের মধ্যেও অসন্তোষের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। মুসলিম লীগে যে নতুন তরুণ নেতৃত্বের উদ্ভব হয়, যাঁরা বৃটিশ শাসনের সঙ্গে সমঝোতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফলে মুসলিম নেতৃত্বের অনেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। যুদ্ধের অর্থনৈতিক সঙ্কটের বোঝা মুসলিম জনসাধারণকেও বহন করতে হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কের প্রতি মিত্রশক্তি এবং বৃটেনের আচরণে মুসলিম জনসাধারণের মনে তীব্র বৃটিশ বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা বৃদ্ধি পায়। মুসলিম জনসাধারণ তুরস্কের খলিফাকে দেখতেন তাঁদের ধর্মগুরু হিসাবে। তুরস্কের সম্মান ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে প্রতিবাদে শুরু হয় খেলাফৎ আন্দোলন।

অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তির প্রস্তুতি ঃ

এই ভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ও তারপরের ঘটনা প্রবাহের ফলে যে পটভূমি সৃষ্টি হয় সেই পটভূমিতে গান্ধীজির উত্থান জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে এক নতুন যুগের সূচনা করে। অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত হয়ে ওঠে। ব্যাপক মূল্য-বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় শিল্পবিকাশের আশাও ধূলিস্যাৎ হল। কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দিল এবং ভারতীয় শিল্পেরও সংকট উপস্থিত হল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আশা ভঙ্গ হল। যুদ্ধের শেষে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মতই বৃটিশরা ঔপনিবেশিক শাসন সমাপ্ত করবার কোনো আগ্রহ দেখাল না। মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের শাসন সংস্কার ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কোনো আশাই পূর্ণ করল না।

গ্রহণের অযোগ্য এই প্রস্তাব বৃটিশ সরকার বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি করল। রাওলাট বিল ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড জাতীয়তাবাদের আবেগকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। খেলাফৎ প্রশ্নে মুসলিম জনসাধারণের বৃটিশবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বহির্বিশ্বের ঘটনাবলী ব্যাপকভাবে ভারতীয় জনমানসকে প্রভাবিত করে। রুশ বিপ্লবের সাফল্য বৃটিশ শাসনে নিপীড়িত

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ এবং বুদ্ধিজীবিদের মনে এক নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করে। আয়ারল্যাণ্ডে ব্রিটিশদমন নীতি ভারতীয়দের কাছে ব্রিটিশ শাসনের নৃশংস দিকটিই তুলে ধরল। জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিশরের গণ অভ্যুত্থান, কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টা এবং চীনের ৪ঠা মে-র আন্দোলন ভারতীয় জনসাধারণকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। এই পরিস্থিতিতে বিক্ষুব্ধ ভারতীয় জনসাধারণ অপেক্ষা করছিলেন এমন এক নেতৃত্ব ও আন্দোলনের যা তাঁদের জাতীয়তাবাদী আবেগকে সংহত করে এক নতুন পথে পরিচালিত করবে।

গান্ধীজির উত্থান ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গান্ধীজি যে দর্শন গড়ে তুলেছিলেন তা হল সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহের মূল ভিত্তি ছিল দুটি, সত্য এবং অহিংসা। গান্ধীজির সহজ সরল জীবন ধার্মিক মনোভাব সাধারণ ভারতীয় জনগণের মধ্যে তাঁর প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। কায়িক শ্রম এবং চরকার উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি স্বদেশীকে জোরদার করে তোলেন। যখন বিভিন্ন ভারতীয় নেতৃবর্গ মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার সম্পর্কিত আলোচনায় ব্যস্ত তখন তিনি চম্পারণে এবং গুজরাটের কইরা জেলায় কৃষকদের দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নামলেন। আমেদাবাদে—শ্রমিকদের আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিলেন তিনি। সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকদের এই আন্দোলনে তার প্রধান হাতিয়ার হল সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহের মাধ্যমেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বৃহত্তম জনসাধারণের অংশ গ্রহণের পথ প্রশস্ত হল এবং জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা গান্ধীজিকে ভারতীয় জনগণের সংগ্রামে পুরোভাগে নিয়ে এল। খেলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধির সুযোগ দেখলেন। এই খেলাফৎ আন্দোলন গান্ধীর উত্থানকে আরো সুদৃঢ় করল। খেলাফতের দাবী মেনে না নেওয়ায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই আন্দোলনের সমর্থনে গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে সমবেত করলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শুরু হল গান্ধী যুগ।

———

১৩ রুশ বিপ্লব

রুশ বিপ্লবের কারণ ঃ

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ায় যে বিপ্লবান্দোলন অনুষ্ঠিত হয় তার ফলে সেখানে জার শাসিত রাজত্বের অবসান ঘটে। স্বৈরাচারী জার শাসিত রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই রুশ বিপ্লবের কারণ নিহিত ছিল।

১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ রাজা সেখানে তাঁর কর্তৃত্ব হারিয়েছিলেন। জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পার্লামেন্ট শাসন সংক্রান্ত সব ব্যাপারে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লব অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে বিশেষতঃ পরবর্তী শতাব্দীতে ইউরোপের সর্বত্র উদারনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ আঘাত করতে থাকে। যার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য সূচিত হয়। কিন্তু রাশিয়াতে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন যার ফলে সেখানে মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রথার অবশিষ্টাংশ বিলুপ্ত হয়। ভূমিদাসরা সেখানে স্বাধীন নাগরিকে পরিণত হয়। তাছাড়া তিনি 'জেমিস্টাভো' নামে স্থানীয় প্রতিনিধি সভাগুলিকে শাসন সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়ে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী রুশ সম্রাটদের আমলে আবার রাশিয়ার অবস্থা পূর্ববৎ হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের পরবর্তীকালে, যেসব জারেরা রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তাঁরা তাঁদের স্বৈরাচারী শাসন অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সব রকমের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এদিকে কিন্তু জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল। সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ভূমিদাসের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জমির মালিকানা স্বত্ব প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তাতে কৃষকদের অবস্থার তেমন উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয়নি। তাছাড়া পুরাতন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করবার ফলে কৃষিপ্রধান রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুন্নত রয়ে গিয়েছিল এবং জনসাধারণের দারিদ্র্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

রাশিয়ার বিপ্লবান্দোলন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, দীর্ঘদিন ধরে তার প্রস্তুতি কোন-না-কোন ভাবে চলছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কার্ল

মার্কস, বাকুনিন প্রমুখের আদর্শে প্রভাবিত সংস্কারপন্থীরা নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। জারতন্ত্রের অত্যাচারের সম্মুখে এইসব সংস্কারপন্থী দল তেমন সুবিধা করতে পারেনি। তবে দ্বিতীয় নিকোলাসের মন্ত্রণাদাতা রাস্‌পুটিনকে হত্যা করে সন্ত্রাসবাদীরা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ জানিয়েছিল।

রাশিয়ার শ্রমিকদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। জারের সরকার শ্রমিকদের উন্নতি সাধনের কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। বিদেশী শিল্পপতিদের প্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে রাশিয়ার শ্রমিকদের নানা প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হত। শ্রমিকদের যেমন কলকারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হত তেমনি তাদের মজুরি ছিল কম। এতে শ্রমিকের অসন্তোষ এক চরম পর্যায়ে পেঁাছেছিল।

দেশের সর্বত্র যখন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে সেই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় হয়। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ট্যানেসবার্গের যুদ্ধে জার্মান সেনাপতি হিন্ডেসবার্গ-এর কাছে রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হওয়ায় জারতন্ত্রের দুর্বলতা জনসাধারণের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত রাশিয়ার অনেকগুলি প্রদেশও হস্তচ্যুত হয়েছিল। এই সব কারণে জারতন্ত্রের প্রতি মানুষের বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে লাগল। রাশিয়ার বিপ্লবীরা নতুন উৎসাহে জারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়ে।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে এক শ্রমিক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার বিপ্লবান্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। জার সরকার এই ধর্মঘট দমন করতে পারেননি। উপরন্তু জারের সৈন্যবাহিনী শ্রমিক ও অন্যান্য বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। ফলে জার দ্বিতীয় নিকোলাস জাতীয় প্রতিনিধি-সভার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে পদত্যাগ করেন। প্রতিনিধি সভা সঙ্গে সঙ্গে এক অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করে। এইভাবেই স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের পতন ঘটেছিল (মার্চ, ১৯১৭)।

রুশ-বিপ্লবের অগ্রগতি ঃ

মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়া একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সরকার যেসব শাসন-সংস্কারের প্রবর্তন করেছিল তা বিপ্লবীদের মনঃপুত হয়নি। এই সময় লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষকরা সংগঠিত হতে থাকে। এইসব সংগঠন 'সোভিয়েত' নামে অভিহিত হয়।

প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ব্যর্থতায় রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে ইতিপূর্বেই দুটি উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। কেরেনস্কি'র নেতৃত্বে 'মেনশেভিকরা' যে কর্মপন্থায় বিশ্বাসী ছিল লেনিনের নেতৃত্বাধীন 'বলশেভিকরা' তা বিশ্বাস করতেন না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বলশেভিকরা ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর কেরেনস্কির সরকারকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করে নেয়। এইভাবে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য লাভ করেছিল।



লেনিন

রাশিয়ার নব-প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক সরকার নানা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। বলশেভিক নেতা লেনিন এই সব সমস্যার যথাযোগ্য সমাধান করে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রথমেই তিনি জার্মানির সঙ্গে ব্রেস্ট লিটভস্ক-এর সন্ধির দ্বারা শান্তি স্থাপন করেন। তারপরে তিনি আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের কাজে তৎপর হন।

ইউরোপ ও বিশ্বে রুশ-বিপ্লবের প্রভাব ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত ফরাসী বিপ্লব যেমন পৃথিবীব্যাপী এক নিদারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল তেমনি বিংশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত রুশ বিপ্লব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পৃথিবীর সর্বত্র এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার সমাজতন্ত্র জয়লাভ করেছিল। এই বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের যে মুক্তির বাণী ধ্বনিত হয়েছিল তা বিশ্বের সর্বত্র গভীর প্রভার বিস্তার করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ঘোষণা করেছিল যে, পৃথিবীর সর্বত্র মুক্তিকামী মানুষের পাশে রাশিয়া দাঁড়াবে, তাদের সর্বতোভাবে সমর্থন করবে। বলা বাহুল্য, এই বিপ্লব ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদে জর্জরিত বিভিন্ন জাতিসমূহের মনে আশার সঞ্চার করেছিল, সাম্রাজ্যবাদীশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে উৎসাহিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন-কারীদের উপরও রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রভাব বিস্তার করেছিল। জওহরলাল

নেহরু, সুভাসচন্দ্র বসু প্রমুখ জাতীয় নেতা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

রুশ-বিপ্লবের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সাম্যবাদের প্রচার প্রসার ঘটানোর জন্য 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদ প্রচারিত হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে জার্মানি ফ্রান্স, ইতালি, চীন প্রভৃতি দেশে সাম্যবাদের প্রসার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব দেশে যে সাম্যবাদী বিপ্লবান্দোলন সাফল্যলাভ করেছিল তা নয়; তবে চীন দেশে মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে একমাত্র রাশিয়া ব্যতীত অপর কোন দেশেই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে রাশিয়ার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে জোরদার করে তুলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তকালে অবশ্য এই আন্দোলন ইউরোপ এবং এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে সাফল্য লাভ করেছে।

১৪	ইউরোপ (১৯১৯-১৯৪৯

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন (১৯১৯ খ্রীঃ)

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটেছিল। ভিয়েনা সম্মেলনে যেমন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা সমেবেত হলেও চারটি প্রধান শক্তি যথাঃ অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও ইংলন্ডের প্রাধান্য ছিল, তেমনি প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা সমবেত হলেও বিজয়ী চারটি শক্তি—আমেরিকা, ইংলন্ড, ফ্রান্স ও ইতালির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে সমবেত রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিরা উচ্চ আদর্শের পরাকাষ্ঠা দেখাতে ত্রুটি করেননি বটে, কিন্তু কার্যতঃ তাঁরা পরাজিত জার্মানির প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন। তিনি সেই সম্মেলনে যে 'চৌদ্দ দফা প্রস্তাব' পেশ করেন তার মাধ্যমে তিনি চেয়েছিলেন ন্যায়, সততা ও ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে পরস্পর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখতে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারেযে, প্যারিসের শান্তিসম্মেলনে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তিতে উইলসনের 'চৌদ্দ দফা প্রস্তাব'-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি বটে কিন্তু 'লীগ অফ নেশনস্' নামে যে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল তার মাধ্যমে উইলসনের আদর্শবাদ আংশিকভাবে জয়যুক্ত হয়েছিল।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পাঁচটি পৃথক পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এইগুলি হ'ল ভার্সাইয়ের সন্ধি, সেন্ট জার্মেইন-এর চুক্তি, নিউলির চুক্তি, ট্রিয়ানস ও সেভরের চুক্তি।

চুক্তি সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভার্সাইয়ের সন্ধি। এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল পরাজিত জার্মানি ও মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে। এই সন্ধির শর্তানুসারে জার্মানি ফ্রান্সকে আলসেস্ ও লোরেস ফিরিয়ে দেয়। তাছাড়া জার্মানি লোরেসনেট ইউপেন ও মেমেডি বেলজিয়ামে এবং বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত মেমেলে বন্দর মিত্রশক্তিবর্গের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য

হয়। জার্মানির উপনিবেশগুলি আন্তর্জাতিক রক্ষণাধীনে স্থাপন করা হয়েছিল। তাছাড়া অপরাপর সামরিক ও অর্থনৈতিক শর্তাদির মাধ্যমে জার্মানির সামরিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তার ওপর এক বিরাট ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়।

ভার্সাই সন্ধির মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে চিরতরে পঙ্গু করে রাখা এবং জার্মানি যাতে ভবিষ্যতে আবার আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। তাছাড়া জার্মানিকে যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী করে তার ওপর বিরাট শাস্তির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। স্বভাবতই জার্মানির ওপর প্রতিশোধপরায়ণ মনোভাব গ্রহণ করবার দরুন বলা যেতে পারে যে, ভার্সাই চুক্তির রচয়িতারা নিজেদের কুটনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। জার্মানির ওপর বলপূর্বক কতকগুলি শর্ত চাপয়ে দেবার ফলে সে প্রথম থেকেই ঐগুলোর বিরোধিতা করতে থাকে। এই বিরোধিতা থেকে শেষ পর্যন্ত জার্মানরা ভার্সাই সন্ধিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মিত্র শক্তিবর্গের ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। এই মনোভাব থেকেই জার্মানি আবার আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করতে উদ্যোগী হয়।

পরাজিত অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মিত্রশক্তিবর্গ স্বাক্ষর করে সেণ্টজার্মেইন-এর সন্ধি। অস্ট্রিয়াকে সন্ধির শর্তানুসারে তার সাম্রাজ্যের অনেকখানি অংশ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। হাঙ্গেরীকে ট্রিয়ানন-এর সন্ধির দ্বারা মিত্রশক্তিবর্গের কাছে বেশ কিছু অঞ্চল হারাতে হয়েছিল। অনুরূপভাবে নিউলি ও সেভরের চুক্তির ফলে যথাক্রমে বুলগেরিয়া ও তুরস্ককে অনেক জায়গা হারাতে হয়েছিল। এইভাবে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে ইউরোপের মানচিত্র একরকম পুনর্গঠিত করা হয়েছিল বলা যেতে পারে। পূর্বেকার পোল্যান্ড রাজ্য পুনর্গঠিত হয়। আবার অনেকগুলি নতুন রাজ্যও আত্মপ্রকাশ করে; যেমন—রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি।

ফ্যাসিবাদের উদ্ভব :

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন ইতালিবাসীর মনে হতাশার সৃষ্টি করেছিল। ফ্রান্সের কাছ থেকে কর্সিকা, স্যাভয়, নিস্ প্রভৃতি ইতালির অবিচ্ছেদ্য অংশগুলি ফেরত না পাওয়ার ফলে ইতালিবাসীদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মিত্রশক্তিবর্গ ইতালির আশা আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। ইতালির স্বার্থকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

ফলশ্রুতি হিসাবে ইতালির সর্বত্র দেখা দেয় চরম দুরবস্থা। বেকারত্ব, দারি ও মূল্যবৃদ্ধি দেশের সর্বত্র এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থার মধ্য দিয়েই ইতালিতে ফ্যাসিবাদের সৃষ্টি হয়।



মুসোলিনী

বেনিটো মুসোলিনি নামে জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে ইতালিতে 'ফ্যাসিস্ট দল' গঠিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ইতালিতে সমাজতান্ত্রিক দলও গড়ে উঠেছিল। ফ্যাসিস্ট দল ও সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা ছিল এবং এই বিরোধিতা ক্রমে এক প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিস্টরাই জয়ী হয়। সমাজতা দল পরাজিত হবার ফলে ফ্যাসিস্টদের ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অনেক বে গিয়েছিল। ক্রমে ফ্যাসিস্টরা তদানীন্তন ইতালীয় সরকারকে পদচ্যুত ইতালির সরকারি ক্ষমতা দখল করতেও সমর্থ হয়।

মুসোলিনীর নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্ট দলের আভ্যন্তরীণ নীতির উদ্দেশ্য ি স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধন করা। তাছ প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে ইতালির প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার প্রতি করাকে ফ্যাসিস্টরা তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিল। উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ফ্যাসিস্ট দল চাইছিল মিত্রশক্তিবর্গের কাছ থে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে এবং তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। পররাষ্ ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট দলের আরও লক্ষ্য ছিল বিশ্বের সর্বত্র ইতালির উপনি গড়ে তোলা।

ফ্যাসিস্ট দল সরকারী ক্ষমতা দখল করবার পরে ইতালির আভ্যন্তর পুনরুজ্জীবনের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। অর্থনৈতিক উ বিধানের জন্য নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া হ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য যাতে ইতালিকে পরমুখাপেক্ষী হয়ে না থাক হয়, সেইজন্য শিল্প ও কৃষি উৎপাদন সমানভাবে বাড়ানো হয়। কৃষি-সম

সমিতি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপন, বৈদেশিক বাণিজ্যপোত নির্মাণ প্রভৃতি অর্থনৈতিক উন্নতির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ফ্যাসিস্টরা ইতালির জনসাধারণের মধ্যে আজ্ঞানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবৃদ্ধির জন্য সর্বত্র প্রচারকার্য চালাতে থাকে। দেশে শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করে একক অধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইতালিতে জন প্রতিনিধিসভা বজায় রাখা হ'ল বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোন ক্ষমতাই থাকল না। এমনকি ফ্যাসিস্ট শাসনে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকেও খর্ব করা হয়। পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইতালি এক জবরদস্ত নীতি অনুসরণ করে ইউরোপের সর্বত্রএক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনি। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে আবিসিনিয়ার রাজাকে পরাজিত করে মুসোলিনি তা দখল করে নেন। ইতিমধ্যে জার্মানিতে নাৎসীবাদ নামে একক অধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে জার্মানির সঙ্গে ইতালির মিতালি হয়।

জার্মানিতে নাৎসীবাদের উত্থান ঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানি এক হতাশাগ্রস্ত দেশে পরিণত হয়েছিল। প্যারিসের সম্মেলনে হীনমর্যাদা হবার পরে জার্মানদের মধ্যে এক ব্যাপক নৈরাশ্য ও হতাশার সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি হিসাবে দেশের সর্বত্র যে চরম বিশৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক দুর্দশা দেখা, দেয় তার ফলে জার্মানি ক্রমশঃ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে ; তার ওপর মিত্রশক্তিরা জার্মানির কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায় করেছিল, তাতে জার্মানির পুনরুজ্জীবনের আশাও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল।

এই অবস্থায় জার্মানবাসীরা যে-কোন প্রচারেই প্রভাবিত হতে থাকে। এই সুযোগে এডলাফ্ হিটলার নামে জনৈক প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী জার্মানিতে 'ন্যাশান্যাল সোস্যালিস্ট বা নাৎসী দল প্রতিষ্ঠা করেন। হতাশাগ্রস্ত জার্মানদের মধ্যে ক্রমাগত প্রচারকার্যের ফলে এই নাৎসী দলের সদস্য-সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে নির্বাচনে জার্মান আইনসভায় নাৎসী-দল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। এইভাবে সরকারী ক্ষমতা দখল করবার পরে হিটলার নিজেকে জার্মানির সর্বপ্রধান নেতা বা 'ফুহ্রার' বলে ঘোষণা



হিটলার

করেন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নাৎসী দল চাইছিল সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করতে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জার্মানিকে স্বাবলম্বী করে তুলতে। তাছাড়া ইহুদী ও সমাজতান্ত্রিকদের বিরোধিতা করাও নাৎসী দলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হিটলার বিরচিত 'মে'ই ক্যাম্পফ্' গ্রন্থে নাৎসীদের কর্মপন্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে। পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নাৎসীরা চাইছিল ভার্সাই সন্ধির পরিবর্তন। অর্থাৎ সেই সন্ধির দ্বারা জার্মানিকে যেভাবে অপমানিত করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। ইউরোপের সর্বত্র যেসব জার্মান ভাষাভাষীর মানুষ আছে তাদের সকলকে জার্মান সাম্রাজ্যভুক্ত করাও হিটলারের নেতৃত্ব নাৎসীদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

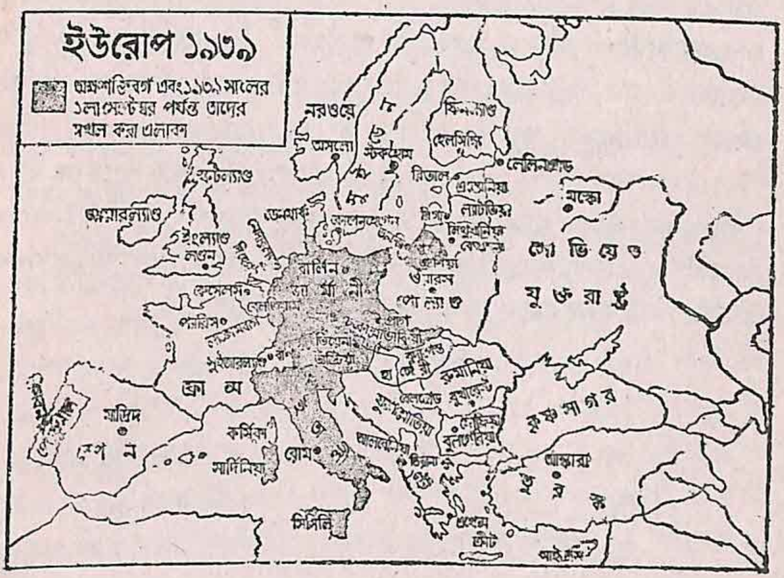
এইসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে হিটলার জার্মানির পুনর্গঠনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। নানাবিধ বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জার্মানির অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বাড়িয়ে তোলা হয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজকে ত্বরান্বিত করা হয়। তাছাড়া কৃষিব্যবস্থার পুনর্গঠনের দ্বারা ফসল উৎপাদনের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম উৎপাদনকে আগেকার তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। উপরি-উক্ত ব্যবস্থার ফলে জার্মানি এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং তা স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপীয় শক্তিসমূহের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল।

এইভাবে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলে জার্মানির নাৎসী নেতা হিটলার পররাজ্য গ্রাস করতে উদ্যোগী হন। অস্ট্রিয়া, সুদেতেনল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ তিনি একে একে গ্রাস করতে থাকেন। ইংলন্ড ও ফ্রান্স এই সময় জার্মানিকে তোষণ করবার নীতি গ্রহণ করেছিল। সুদেতেনল্যান্ড অধিকারের পরে রাশিয়াও জার্মানির কার্যকলাপে ভীতগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং তার সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য 'অনাক্রমণ চুক্তি' স্বাক্ষর করে। কিন্তু এতেও জার্মানির পররাজ্যগ্রাসের স্পৃহা বিন্দুমাত্র কমেনি। সে এইবার পোল্যান্ড আক্রমণে উদ্যত হয় এবং তা থেকেই শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯ খ্রীঃ)।

জাতিসংঘ : সাফল্য ও ব্যর্থতা :

যুদ্ধের বীভৎসতা থেকেই মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষকে অন্ততঃ সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরোধী করে তুলেছিল। বিশ্ববাসী স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সেই প্রচেষ্টা থেকেই জন্মলাভ করে 'জাতিসংঘ' নামে আন্তর্জাতিক সংস্থা।

জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা। বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি ও সৌহার্দ্যবোধ জাগরিত করে তাদের যুদ্ধ বা বিবাদ-বিসংবাদ থেকে নিবৃত্ত করা। এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে জাতিসঙ্ঘের স্রষ্টারা কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন ; যেমন ঃ আক্রমণকারীর



ভূমিকায় অবতীর্ণ দেশ বা একাধিক দেশের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে চাপসৃষ্টি করা। চাপ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনবোধে অর্থনৈতিক ও সামরিক অস্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থাও জাতিসঙ্ঘের সনদ বা চুক্তিপত্রে উল্লিখিত ছিল।

১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বাবধি জাতিসঙ্ঘ তার অস্তিত্বকে বজায় রাখতে পেরেছিল। এই দীর্ঘ কুড়ি বছরে জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি রক্ষার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তুরস্ক ও ইরানের বিবাদে জাতিসঙ্ঘ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। ঐ দুই দেশের সীমা নির্ধারণ করে দেবার ফলে আসন্ন যুদ্ধ থেকে দু'টি দেশ রক্ষা পেয়েছিল। পোল্যাণ্ড-লিথুয়ানিয়া এবং গ্রীস-বুলগেরিয়ার বিরোধে জাতিসঙ্ঘ সাফল্য অর্জন করেছিলো। অর্থাৎ ঐ দুটি বিরোধ সময়মত হস্তক্ষেপ করে জাতিসঙ্ঘ তার নিষ্পত্তি করতে সমর্থ হয়েছিল। এইভাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে জাতিসঙ্ঘ সাফল্য অর্জন করলেও সবক্ষেত্রেই যে ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে কাজ করতে পেরেছিল, তা মোটেই বলা যায় না।

জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে অনেকগুলো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এই সব চুক্তি বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছিল। আবার একাধিক ক্ষেত্রে লীগ সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করতে না পারার ফলে বিভিন্ন দেশ ধীরে ধীরে জাতিসঙ্ঘের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকে। জাপান ও জার্মানি জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে চলে যাবার পরে জাতিসঙ্ঘের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ইতিপূর্বেই অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি বৃহৎ শক্তি জাতিসঙ্ঘের বাইরে থাকার ফলে তার ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া সদস্য-রাষ্ট্রগুলির আন্তরিকতার অভাবও জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। সবশেষে বলা যেতে পারে যে, বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থের পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্তকে জাতিসঙ্ঘ কার্যকরী করতে পারেনি। এই সব কারণেই মূলতঃ জাতিসঙ্ঘ ব্যর্থ হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার কাজে তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

---

১৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির কুড়ি বছর পরেই আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় যাকে 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক ও ভয়াবহ ছিল। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন বিশ্ব-রাজনীতিতে যে উগ্রতা দেখা দিয়েছিল তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটাতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ ভার্সাই সন্ধির মধ্যে নিহিত ছিল। ভার্সাই চুক্তির দ্বারা জার্মানির ওপর যে ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তার অর্থনীতি ও সামরিক শক্তিকে যেভাবে আঘাত করা হয়, তা দূরদর্শিতা বা নৈতিকতা কোনও দিক দিয়েই সমর্থন করা যায় না। বিজয়ী দেশগুলি চেয়েছিল জার্মানির ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জার্মান জাতির পক্ষে অপমানজনক এই ভার্সাই সন্ধি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং জার্মান জাতি প্রথম থেকেই ভার্সাই সন্ধির বিরোধিতা করতে থাকে এবং সন্ধির শর্তগুলিকে নাকচ করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়।

জার্মানি যাতে ভবিষ্যতে ক্ষমতা অর্জন করে আবার বিশ্বশান্তিকে বিঘ্নিত করতে না পারে, সেইজন্য বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ তার সামরিক শক্তিকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছিল। কিন্তু অপরাপর শক্তি নিজেরা কিন্তু তাদের সামরিক শক্তি এতটুকুও কমায়নি। অর্থাৎ জার্মানির সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দেশের সামরিক শক্তি হ্রাস করাও যে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তা প্রধান প্রধান শক্তিরা উপলব্ধি করতে পারেনি। এর পরিণতি হিসাবে এমন একদিন এসেছিল যখন জার্মানি আবার তার নিজ শক্তিবৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হয়েছিল। জার্মান জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠে প্রথমেই ভার্সাই সন্ধিতে তাদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে থাকে।

হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানি সামরিক শক্তি অর্জন করে প্রথমেই বিভিন্ন রাজ্য গ্রাস করতে থাকে। জার্মানির বাইরে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী জার্মান ভাষা-ভাষীর মানুষকে একই জার্মান সাম্রাজ্যভুক্ত করাই ছিল হিটলারের উদ্দেশ্য।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে, এই অজুহাতে হিটলার ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করে নেয়।

হিটলার যখন আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করে একে একে রাজ্য দখল করে চলেছেন, তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানিকে তোষণ করবার নীতি গ্রহণ করেছিল। উপরন্তু জার্মানি, ইতালি ও জাপান যখন 'এ্যানিটকমিনটার্ণ' চুক্তি স্বাক্ষর করে, তখন ফ্রান্স ও ইংলণ্ড মনে করেছিল যে জার্মানির আক্রমণের লক্ষ্য কেবল রাশিয়া। সেই কারণে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা জার্মানিকে প্রতিরোধ করবার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনগুলি কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছিল। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশের সামরিক সাজ-সরঞ্জামের উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে যুদ্ধপ্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই সম্মেলনগুলিতে সমবেত দেশগুলি ঐক্যমতে পেঁছাতে পারেনি। জার্মানি ফ্রান্সের সমপরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র রাখতে চাইলে ফ্রান্স তাতে তীব্র আপত্তি জানায়। এর ফলে জার্মান সদস্যরা ১৯৩২-৩৩ সালের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ করে। তারপরেই শুরু হয় জার্মানদের সমরসজ্জা।

আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার্থে লীগের অক্ষমতাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান না করবার ফলে জাতিসংঘ প্রথম থেকেই ছিল দুর্বল। তাছাড়া ঐ সংস্থার সদস্যপদের পরস্পর বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার কাজকে ব্যাহত করেছিল। উপরন্তু জার্মানি যখন আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুনকে অগ্রাহ্য করে ক্রমাগত দেশ জয় করছিল, তখন তাকে জাতিসংঘ কোনভাবেই বিরত করতে পারেনি বা তাকে শাস্তি দিতে পারেনি। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক সংস্থার ওপর সকলেই আস্থা হারিয়েছিল এবং একে একে সদস্যরাষ্ট্ররা সদস্যপদ ত্যাগ করতে থাকে।

ইতালীতে ফ্যাসীবাদের উত্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। ইতালীর আগ্রাসীনীতির প্রতিরোধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি শক্তিবর্গ যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেনি। স্পেনের গৃহযুদ্ধে আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে ইতালী এবং জার্মানির সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ছিল বস্তুতঃ পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য অনেকখানি দায়ী। মাঞ্চুরিয়ার ওপর জাপানের আক্রমণ লীগের ব্যর্থতাকে যেমন স্পষ্ট করে

তুলেছিল, তেমনি তা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ইতালী, জার্মানি ও জাপান—এই তিন আগ্রাসী দেশ নিয়ে গড়ে উঠল অক্ষশক্তি।

উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করলে আনুষ্ঠানিক-ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে জন্মলাভ করেছিল দুটি চরম শক্তির। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপরদিকে সোভিয়েত রাশিয়া—এই দুটি চরমশক্তি এখন থেকে বিশ্ব-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। দুটি চরম শক্তির পাশাপাশি আগেকার ইংলন্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশের ক্ষমতা ও শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতিপত্তিও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিক থেকে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে তা থেকে, শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছিল। এই রাষ্ট্রপুঞ্জ আগেকার জাতিসংঘ থেকে ছিল অনেক বেশী শক্তিশালী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর বিভিন্ন পরাধীন জাতিসমূহের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের পতনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

———

১৬ ভারতবর্ষ (১৯১৯-১৯৪৭)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় ঃ

গান্ধীজির উত্থানের এবং সত্যাগ্রহ আদর্শের সফল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণ শুরু হয়। সত্যাগ্রহের আদর্শ ছাড়াও গান্ধীজি গুরুত্ব দিলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির উপর। এর ফলে জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি শক্ত হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমশঃ গতিলাভ করে।

অসহযোগ আন্দোলন ঃ

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গান্ধীজি কংগ্রেসের মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী উভয় অংশকেই এক জায়গায় আনতে সমর্থ হলেন। এছাড়া খিলাফৎ সমস্যা সমাধানেরও দাবি করা হল। গান্ধীজি ঘোষণা করলেন অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ, প্রথমে স্বরাজ ও পরে দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালিত হবে। গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন সফল করার জন্য সরকারী খেতাব বর্জন, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল-কলেজ বর্জন, আইন সভার সদস্যপদ বর্জন, বিলাতী কাপড় ও দ্রব্য বর্জন, খাদি পরিধান এবং সরকারী খাজনা বন্ধের আহ্বান জানান।


গান্ধীজি

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সারা দেশে অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজ বর্জন করে বিলাতী কাপড় পুড়িয়ে সর্বত্র পিকেটিং শুরু করে। দলে দলে মহিলারাও বেরিয়ে এলেন পর্দা ছেড়ে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল নেহেরু আইন ব্যবসা ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু আই·সি·এস· চাকুরি ত্যাগ করে অংশগ্রহণ করলেন আন্দোলনে।

হাজার হাজার লোক অহিংসভাবে গ্রেপ্তার বরণ করেন। খিলাফৎ কমিটি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য প্রচার শুরু করেন এবং সৈন্যদলে যোগ না দেওয়ার জন্য মুসলিম জনসাধারণকে আহ্বান জানান। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় এবং তাঁরা আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সামিল হন।

আন্দোলন চলাকালীন সময়ে উত্তর প্রদেশের চৌরীচৌরা নামক স্থানে সাধারণ মানুষ পুলিশের অত্যাচারে উত্তেজিত হয়ে থানায় আগুন লাগিয়ে দেন। এতে ২২ জন পুলিশ প্রাণ হারায়। গান্ধীজি মর্মাহত হয়ে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করেন।

জাতীয় আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ঃ

গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনের আগেই চম্পারণে তিনকাঠিয়া ব্যবস্থা ও নীলকরদের বিরুদ্ধে এবং গুজরাটে কইরা জেলায় কৃষকদের নিয়ে খাজনা বন্ধের আন্দোলন করেন। তার ফলে জাতীয় আন্দোলনে কৃষকদের অংশগ্রহণের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। আমেদাবাদের মিল মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রামও শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরে। ইতিমধ্যে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের প্রশ্নটিও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গ্রামে কৃষকদের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি হয়। খাজনা বন্ধের আহ্বান কৃষকদের মধ্যে সাড়া জাগায়। বাংলার মেদিনীপুর, বিহারের ছোটনাগপুর, উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলী, ফৈজাবাদ, দক্ষিণ ভারতে গুণ্টুর, কৃযড়া, গোদাবরী এবং মালাবার জেলায় কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আন্দোলনগুলির আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও গ্রামের কৃষকদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ ইংরেজদের বেশ বেকাদায় ফেলেছিল। একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সঠিকভাবে সংগঠিত করতে সমর্থ হলে বৃটিশ রাজত্বের ভিত্তি নাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই জাতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় এমন এক শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার কথা আলোচিত হয়। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠান তেমন গড়ে ওঠেনি। তবে বিহারের জামসেদপুর এবং মহারাষ্ট্রের বোম্বাই অঞ্চলে ইস্পাত ও যন্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছিল। সেখানে কাজ করতো বেশ কয়েক লক্ষ শ্রমিক। তাছাড়া অন্যান্য জায়গায়ও কয়েকটি শিল্প গড়ে ওঠায়, এদেশে রীতিমত শ্রমিক সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। এরা অসহযোগ আন্দোলনের সময় নানাবিধ দাবিতে

বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। বড় বড় কোলিয়ারিগুলিতে এই সময় আন্দোলন শুরু হয়। এর পর বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠতে থাকে শ্রমিক সংগঠন। শ্রমিকদের আন্দোলন নিঃসন্দেহে অসহযোগ আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছিল।



চিত্তরঞ্জন দাস



মতিলাল নেহেরু

স্বরাজ আন্দোলনঃ যখন গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন, তখন জাতীয় আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। অনেক জাতীয় নেতৃবর্গ তখন জাতীয় আন্দোলন স্থগিত রাখায় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব নেতারা আইনসভা বর্জনের নীতি ত্যাগ করেন। ইতিপূর্বে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজ সরকার কর্তৃক গঠিত আইনসভা বর্জন করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার অনুসারে এদেশে যে আইনসভা গঠিত হয়, সেখানে প্রবেশ করে অভ্যন্তর থেকে সরকারী কাজকর্ম ব্যর্থ করে দেওয়াই ছিল স্বরাজ দলের উদ্দেশ্য।

আইন-অমান্য আন্দোলন ঃ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের শাসন ব্যাপারে নতুন কি কি সুবিধা দেওয়া যেতে পারে তা বিচার-বিবেচনার জন্য সাইমন-এর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশন 'সাইমন কমিশন' নামে খ্যাত। কিন্তু এই কমিশন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছিল। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী এক নতুন

আন্দোলনের প্রস্তুতি করেন এই আন্দোলন সাধারণভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন নামে পরিচিত।

সেই সময় ইংরেজদের কুশাসনের ফলস্বরূপ দেশের সর্বত্র অনাহার, দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। গান্ধীজি এই পরিস্থিতিতে নতুন আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন লবণ-আইন ভঙ্গের কর্মসূচী গ্রহণ করে। সেই আমলে লবণ তৈরী করবার অধিকার কারো ছিল না। লবণ ছিল সরকারের একচেটিয়া ব্যবসা। গান্ধীজি এই আইন ভঙ্গ করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করেন। গুজরাটের সমুদ্রোপকূলে ডাণ্ডীতে লবণ-আইন ভাংগার উদ্দেশ্য যাত্রা করেন। লবণ-আইনভঙ্গের নির্দেশ দেশব্যাপী সর্বত্র মানুষেরমনে এক উম্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। বাংলার মেদিনীপুর, গুজরাট, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে আইন-অমান্য আন্দোলন এক তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাহসী পাঠানরা সেই সময় মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ খান আবদুল গফ্ফর খানের নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু করেছিল, তা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আবদুল গফ্ফর খানের নেতৃত্বাধীন পাঠান 'লাল কোর্তা' বাহিনী শান্তিপূর্ণভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন চালিয়েছিল। অবশ্য সরকারী অত্যাচার তাদের ওপর কম হয়নি। কিন্তু পাঠানরা আত্মোৎসর্গের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যেভাবে আইন-অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা ভারতবাসী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়।

গান্ধীজির নেতৃত্বে আইন-অমান্য আন্দোলন সরকারী আক্রমণের সম্মুখে এক রকম ব্যর্থ হয়েছিল বলা যেতে পারে। কারণ এই আন্দোলন ভারতীয়দের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবি আদায় করতে পারেনি। এই সময় থেকে বেশ কিছুদিন ভারতীয় বিপ্লবীরা হিংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা ইংরেজ শাসকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নতুন পর্ব : আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখবার পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবীরা আবার নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে। সন্ত্রাসবাদের এই পর্বে চট্টগ্রাম, ঢাকা, বেনারস, লাহোর, পুণা প্রভৃতি বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

হিন্দুস্থান রিপাব্লিক্যান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কাকোরী ট্রেন ডাকাতির (১৯২৫) খ্রীঃ পরে ইংরেজ পুলিশ বিপ্লবীদের ধর-পাকড়ের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। ইতিমধ্যে কাকোরী ঘটনার সঙ্গে জড়িত চন্দ্রশেখর আজাদ নামে জনৈক বিপ্লবী নতুনভাবে আবার হিন্দুস্থান রিপাব্লিক্যান পুনর্গঠিত করেন এবং

তার নতুন নামকরণ করেন 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন।' এই সংস্থার বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক ভারত প্রতিষ্ঠা করা।

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ছিলেন উপরি-উক্ত সংগঠনের দুজন অক্লান্ত কর্মী। ভগৎ সিং স্যাণ্ডার্স সাহেবকে হত্যা করবার পরে দিল্লীর আইনসভা গৃহে দর্শকের আসন থেকে বোমা ছুঁড়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। এই ঘটনার সূত্রে ভগৎ সিংকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ভগৎ সিং-এর মৃত্যুর পরে চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে আরও বেশ কিছু দিন হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাব্লিক্যান অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে বিপ্লবী কার্যকলাপ চলতে থাকে।

এই পর্বে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে যে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার' লুণ্ঠন হয় তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল প্রভৃতি বিপ্লবীরা ঐ অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছিলেন। এরপরে জালালাবাদ পাহাড়ে শুরু হয় বিপ্লবীদের সঙ্গে ইংরেজদের খণ্ডযুদ্ধ। ১৯৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে সাময়িক ভাঁটা পড়েছিল। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এদেশে আবার সন্ত্রাসবাদের পুনরুত্থান ঘটেছিল।


সূর্য সেন

ভারত ছাড় আন্দোলন ঃ

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এক প্রস্তাবে ইংরেজ সরকারকে স্পষ্টভাবে জানায় যে ভারতবাসী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না। ব্রিটিশ সরকারের কাছে জাতীয় কংগ্রেস আরও জানতে চায় যে, যুদ্ধের পরে ব্রিটিশরা ভারতবাসীকে স্বাধীন জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে রাজী কিনা। কিন্তু এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর ইংরেজ শাসকবর্গের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এশিয়ায় এক চরম মুহূর্তে উপনীত হয়েছে। জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করবার ফলে বিশ্বযুদ্ধের গতির পরিবর্তন ঘটে এবং ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হবার

আশঙ্কা দেখা দেয়। জাপান ভারতবর্ষের ওপর আক্রমণ চালালে এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সাহায্য ও সমর্থন ব্যতীত ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে না এই ভেবে ব্রিটিশ সরকার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ নামে মন্ত্রিসভার একজন সদস্যকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করে। কিন্তু ক্রিপস্-এর দৌত্য ব্যর্থ হয়েছিল। তাঁর প্রস্তাব ভারতের জাতীয় নেতৃবর্গকে খুশী করতে পারেনি বলে তাঁরা তা বর্জন করেছিল।

ক্রিপস্-এর দৌত্য ব্যর্থ হবার পরে মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করেন। গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস একটি প্রস্তাব পাশ করে যে, অবিলম্বে ইংরেজদের ভারত ত্যাগ করে চলে যাবার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক অহিংস সংগ্রামের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী সমেত সব নেতাকে ইংরেজরা কারারুদ্ধ করলে পর জনসাধারণ নেতৃহীন হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই আন্দোলন সর্বক্ষেত্রে আর অহিংস ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে তা সহিংস রূপ গ্রহণ করেছিল।

ইংরেজ সরকার 'ভারত ছাড় আন্দোলন'কে (১৯৪২ খ্রীঃ) চণ্ডনীতির দ্বারা দমন করতে উদ্যোগী হয়। হাজার হাজার মানুষকে কারারুদ্ধ করা হয়। তাতে মরিয়া হয়ে আন্দোলনকারীরা হিংসাত্মক কার্যকলাপ আরও জোরদার-ভাবে শুরু করেছিল। অবশ্য ইংরেজ শাসকবর্গের কঠোর ও অমানুষিক অত্যাচার শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে সমর্থ হয়।

আজাদ হিন্দ বাহিনী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের একনিষ্ঠ দেশসেবক সুভাষচন্দ্র বসু ইংরেজদের শত্রুর সাহায্যে তাদের দেশ থেকে বিতাড়নের পরিকল্পনা করেন। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। তারপরে


সুভাষচন্দ্র বসু

তিনি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বাসগৃহ গোপনে ত্যাগ করে প্রথমে জার্মানি এবং তারপরে জাপানে উপস্থিত হন।

জাপানে উপস্থিত হয়ে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীদের নিয়ে ইতিমধ্যেই গঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্বপদ গ্রহণ করেন। তারপর জাপানের সঙ্গে মিলিতভাবে এবং তাদের সহযোগিতায় ভারত অভিমুখে আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে সুভাষচন্দ্র রওনা হন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যেরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ভারত আক্রমণ করেছিল। একদল আরাকান পর্বতের মধ্যে দিয়ে এবং অপর দল পূর্ব সীমান্তে রওয়ানা হয়েছিল। কিন্তু নেতাজীর আশা ব্যর্থ হয়েছিল। ইতিমধ্যে জাপান মিত্রশক্তিবর্গের কাছে আত্মসমর্পণ করবার ফলে সেই দেশের পক্ষে আর আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সাহায্য করা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু আজাদ হিন্দ বাহিনীর খাদ্য-সরবরাহ প্রভৃতিতে অসুবিধা দেখা দিলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরা ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মসমর্পণের পরে ইংরেজ সরকার সেই বাহিনীর কতিপয় উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করলে সারা দেশে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতবাসীর আন্দোলনের চাপে পড়ে ইংরেজ সরকার আজাদ হিন্দ সামরিক কর্মচারীদের বিচার স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল।

ক্ষমতা-হস্তান্তর ও স্বাধীনতা লাভ (১৯৪৭ খ্রীঃ) ঃ

আজাদ হিন্দ সামরিক কর্মচারীদের বিচারকে কেন্দ্র করে সারা দেশে যখন এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে, তখন ভারতের নৌ-সেনা ও বিমান বাহিনীর বিদ্রোহে ইংরেজ সরকারের শাসন টলে গিয়েছিল। ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল যে এদেশ করায়ত্ত রাখা তাদের পক্ষে আর সম্ভবপর হবে না। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে ভারতে ইংরেজ অনুসৃত নীতির পরিবর্তন ঘটেছিল।

প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলী ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। সেই অনুসারে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ দ্রুত নিষ্পন্ন করবার জন্য মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের 'ভাইসরয়' হিসাবে প্রেরণ করা হয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বুঝতে পারেন যে, ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব হবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, কিন্তু ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ আর থাকবে না। এমতাবস্থায় মাউন্টব্যাটেন ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে নিজেই একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা সাধারণভাবে 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' নামে খ্যাত।

মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হবে। তবে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিকে পৃথক রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কিভাবে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হবে তার বিশদ বর্ণনা মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনায় উল্লিখিত ছিল। আলোচ্য সময়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এমনভাবে চলছিল যে, ভারত বিভাগের প্রস্তাব পরিস্থিতি বিবেচনা একরকম অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

যাই হোক, মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনায় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মেনে নেবার ফলে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে 'ভারতের স্বাধীনতা আইন' গৃহীত হয়। এই আইন অনুসারে ঐ বছর ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছিল।

১৭ চীনদেশের বিপ্লব (১৯১১-১৯৪৯)

ইউ-য়ান-সিকাই ও সান ইয়াৎ সেন-এর মধ্যে বিরোধ ঃ

১৯১২ খ্রীস্টাব্দে ইউ-য়ান-সিকাই প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। প্রজাতান্ত্রিক চীনের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে ইউ-য়ান-সিকাই সমর্থ হননি। এর ফলে প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি প্রথম থেকেই দুর্বল।

এদিকে ইউ-য়ান-সিকাইয়ের কার্যকলাপ চীন দেশের জাতীয়তাবাদীদের মোটেই পছন্দ ছিল না। কারণ, প্রথম থেকেই ইউ-য়ান গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। প্রধানতঃ নিজের ক্ষমতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি বিদেশী ব্যাঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ঋণ-স্বরূপ গ্রহণ করেন। জাতীয়তাবাদীরা ইউ-য়ানের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। সান ইয়াৎ সেনের নির্দেশক্রমে জাতীয়তাবাদীরা ইউ-য়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরে। এমনকি, এই সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অনেক ইউ-য়ানের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে স্বাধীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় খুব স্বাভাবিকভাবেই চীন প্রজাতন্ত্রে গুরুতর সঙ্কট উপস্থিত হয়।

ইউ-য়ান-সিকাই দুর্ধর্ষ সামরিক নেতা ছিলেন। তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করে নিজ ক্ষমতাকে চীনের সর্বত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। সান-ইয়াৎ সেন এই পরিস্থিতিতে জাপানে চলে যান। ইউ-য়ান-সিকাই অতঃপর রাষ্ট্রের সাধরণতন্ত্রীরূপ বজায় রাখলেও কার্যতঃ একজন স্বৈরাচারী একনায়ক হিসাবে দেশ শাসন করতে থাকেন। ১৯১৫ সালে একটি সাজানো ব্যবস্থা অনুসারে জনমত যাচাই করে ইউ-য়ান চীন সাধারণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সেখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি নিজেকে চীনের 'সম্রাট' বলে ঘোষণাও করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে চীনাদের মধ্যে এতই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল যে, ইউ-য়ান সাময়িকভাবে তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। চীনদেশে সেই সময় বিদ্রোহীরা ইউ-য়ানের পদত্যাগ পর্যন্ত দাবি করেছিল। কিন্তু ইউ-য়ান-সিকাই-এর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবার আগেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন (১৯১৬ খ্রীঃ)।

সামরিক নেতাদের কবলিত চীনদেশ ঃ কুনোমিনতাং ঃ

ইউ-য়ান-সিকাইয়ের মৃত্যুর পরে চীন দেশের সর্বত্র চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। চীনদেশের সর্বত্র

সামরিক নেতারা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। সামরিক নেতারা স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠে দেশের সংহতিকে বিপন্ন করে তোলে। সামরিক নেতাদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। তাঁরা সর্বদাই নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত থাকতেন। এক কথায় বলতে গেলে, গৃহযুদ্ধ তখন সামরিক নেতাদের একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

চীনদেশের প্রচলিত গৃহযুদ্ধ থেকে তাকে মুক্ত করা সান ইয়াৎ সেনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে সান ইয়াৎ সেন ক্যান্টনে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। কিন্তু চীনের উত্তরাঞ্চল তো নয়ই, এমনকি দক্ষিণাঞ্চলেও ক্যান্টন সরকারের আধিপত্য স্থাপিত হয়নি। সান ইয়াৎ সেন বৈপ্লবিক সংগঠনে পারদর্শী হলেও কুয়োমিনতাঙ্ দলকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারেন নি।

সান ইয়াৎ সেন কুয়োমিনতাঙ্ দলের দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কুয়োমিনতাঙ্ দলকে যদি নতুনভাবে গঠন করা না যায় তাহলে এই দলের নেতৃত্বে দেশ গঠনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। তিনি একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে কুয়োমিনতাঙ্ দলে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাপ্রতিষ্ঠা জাতির পুনরুজ্জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই ব্যাপারে সান ইয়াৎ সেন রাশিয়ার কমিউনিস্ট পরামর্শদাতাদের সাহায্য গ্রহণ করাই মনস্থির করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি কয়েকজন রুশ পরামর্শ-দাতার সাহায্যে কুয়োমিনতাঙ্ দলকে পুনর্গঠিত করেন। অবশ্য একথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে সান ইয়াৎ সেন কমিউনিস্ট ছিলেন। তবে পাশ্চাত্য শক্তির ওপর বিশ্বাস হারানোর ফলেই তিনি রাশিয়ার কমিউনিস্ট সংগঠকদের সাহায্য নিয়েছিলেন।

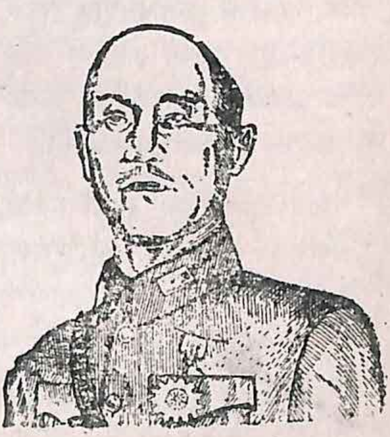
সান ইয়াৎ সেন কুয়োমিনতাঙ্ দলের সামনে তিনটি আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। এই আদর্শগুলি 'স্যান-মিন-চু-আই' নামে খ্যাত। তিনটি নীতির মূল কথা ছিল : (ক) সর্বসাধারণের সাহায্যে পরিচালিত এবং জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা যাকে তিনি 'গণতন্ত্র' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। (খ) সর্বসাধারণের জীবন ধারণের উপযোগী ব্যবস্থাকে তিনি তার দ্বিতীয় নীতি বলে ঘোষণা করেন। একে তিনি 'সমাজতন্ত্র' আখ্যা দিয়েছিলেন। (গ) বিদেশী নিয়ন্ত্রণ থেকে দেশকে মুক্ত করা ছিল সান ইয়াৎ সেনের তৃতীয় নীতি। এই নীতি তিনি 'জাতীয়তাবাদ' বলে অভিহিত

করেন। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে সান ইয়াৎ সেন মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় দেশ গঠনের কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

৪ঠা মে আন্দোলন : লং মার্চ : সিয়ান ঘটনা : সামরিক নেতাদের বর্বলিত চীন দেশে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তা একাধিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনে এক পরিবর্তন সূচিত হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে তা শুরু হলেও চীনের সাংস্কৃতিক জীবনকে ঐ আলোচনা প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল।

পিকিং শহরের ছাত্র-আন্দোলনের মাধ্যমে ৪ঠা মে আন্দোলনের সূচনা হয়। বেশ কয়েক হাজার ছাত্র সেখানে মিলিত হয়ে মন্ত্রীদের অপদার্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কেবল তাই নয় ছাত্ররা সেখানে ধর্মঘট পালন করে এবং ক্রমে তা চীনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের এই আন্দোলন ক্রমশঃ বিদেশীদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়। ছাত্ররা বিদেশী জিনিসপত্র 'বয়কট' বা বর্জন করে স্বদেশে প্রস্তুত জিনিসপত্র ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছিল। গভীর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ এই ৪ঠা মে আন্দোলন চীনদেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনে পরিবর্তন এনেছিল। এই সময় থেকে চীনদেশে সাম্যবাদী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে চীনদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। সেই সময় থেকে সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যু পর্যন্ত কুয়োমিনতাঙ দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক ভাল ছিল। সান ইয়াৎ সেন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, চীনদেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে সামরিক নেতাদের হাত থেকে চীনদেশকে মুক্ত করতে গেলে কমিউনিস্টদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। আবার কমিউনিস্টরা তাদের পার্টি সংগঠন বাড়ানোর জন্য কুয়োমিনতাঙ দলের সঙ্গে সমঝোতা একান্ত প্রয়োজন ছিল বলে মনে করেছিল। সেই কারণে সান ইয়াৎ সেনের আমলে কুয়োমিনতাঙ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে বিরোধ ছিল না বরঞ্চ উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর।



চিয়াং কাইশেক

কিন্তু চিয়াং কাইশেক-এর আমলে এই সমঝোতায় চিড় ধরেছিল। চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্টদের বিরোধিতা শুরু করেছিলেন।

সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পরে চিয়াং কাইশেক যখন জাতীয় বাহিনী নিয়ে সামরিক নেতাদের কবল থেকে চীনদেশকে মুক্ত করে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে উদ্যোগী হন তখন কুয়োমিনতাঙদের কমিউনিস্টরাও যোগদান করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি চিয়াং কাইশেককে বিচলিত করে তোলে। তিনি অতঃপর তাদের জাতীয় বাহিনী থেকে বহিষ্কার করে তাদের ধ্বংস করতে উদ্যোগী হন।

ইতিমধ্যে চীনা কমিউনিস্টরা মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে কিয়াং-সি অঞ্চলে নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। চিয়াং কাইশেক কিয়াং-সি অঞ্চলে কমিউনিস্টদের ওপর চরম আক্রমণ শুরু করলেপ্রথম দিকে তারা তা প্রতিরোধ করতে পেরেছিল। অল্পদিনের মধ্যেই কমিউনিস্টরা কিয়াং-সির ঘাঁটি ছেড়ে সেনসি প্রদেশে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কিয়াং-সি থেকে সেনসি প্রদেশে কমিউনিস্টদের যাত্রা ইতিহাসে 'দীর্ঘ' পদযাত্রা' নামেখ্যাত। প্রায় ৬০০০ মাইল দীর্ঘ পদযাত্রায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। এক বছর ধরে ক্রমাগত যাত্রা করবার ফলে ৯০ ০০০ পদযাত্রীদের মধ্যে মাত্র ৩০,০০০ গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছাতে পেরেছিল। কিন্তু এর ফলে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং পদযাত্রার অঞ্চলগুলিতে ভূমি সংস্কারের আদর্শ প্রচারের ফলে কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রতি আস্থাও বাড়তে থাকে।


মাও-সে-তুং

সেনসি প্রদেশে পৌঁছানোর পরেও চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্টদের ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকেন নি। তিনি কমিউনিস্টদের উৎখাত করতে চ্যাং-সু-পিয়াং নামে জনৈক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। সেখানে চ্যাং কিন্তু শেষ পর্যন্ত

কমিউনিস্টদের ওপর আক্রমণ চালান নি। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইতি-মধ্যে জাপান চীন দেশের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে।

ইতিমধ্যে চিয়াং কাইশেক সিয়ান নগরীতে এসে পেঁছালে চ্যাং-এর সৈন্যরা তাকে কারারুদ্ধ করে এবং কয়েকটি দাবি পেশ করে। কমিউনিস্টদের সঙ্গে সমঝোতা করে জাতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুগ্মভবে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করবার দাবি ছিল প্রধান। এই দাবি চিয়াং কাইশেক মেনে নেবার ফলে চ্যাং তাঁকে মুক্তি দেয়। অতঃপর কমিউনিস্ট ও কুয়োমিনতাঙ যুগ্মভাবে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়।

জাপান ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে মিত্রশক্তিবর্গের কাছে আত্মসমর্পণ করায় চীন-জাপান যুদ্ধের ইতি ঘটেছিল। সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট ও কুয়োমিনতাঙ বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এরপরেই শুরু হয় উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্টরা জয়লাভ করেছিল। চীনদেশের মূল ভূখণ্ড কমিউনিস্টদের দখলে চলে আসায় চিয়াং কাইশেক তাঁর জাতীয়তাবাদী সরকারকে ফরমোজা দ্বীপে স্থানান্তরিত করেন। এইভাবে চীনদেশে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৪৯ খ্রীঃ)। মাও-সে-তুং এই নগরীতে চীনা গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রীর প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন।

———

১৮ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো জাপান কর্তৃক অধিকৃত হয়। ইতিপূর্বে সেখানকার দেশগুলো ছিল ইউরোপের তিনটি ঔপনিবেশিক শক্তির পদানত। ঔপনিবেশিক শক্তিরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়েছিল। ক্রমে সেখানকার মানুষ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে। তারা নিজেদের দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করতে উদ্যোগী হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সাধারণভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষের কাছে নানা অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি যেসব দেশ সেখানে শাসন চালাচ্ছিল তাঁরা প্রত্যেকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পদ ও লোকবল যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য, তাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে দেখা দিয়েছিল নিদারুণ অর্থসঙ্কট, খাদ্যাভাব প্রভৃতি। ইতিমধ্যে জাপান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় এশিয় শক্তি জাপান সহজেই সেখানে তার সৈন্যবাহিনী নামায় এবং সাময়িকভাবে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনকে আঘাত করে।

জাপান ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে উচ্ছেদ করে নতুন ধ্বনি তুলেছিল ; এশিয়া—এশিয়াবাসীদের জন্য ! এই ধ্বনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে। এই ধ্বনি পরোক্ষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদ প্রসারের পথ সুগম করেছিল। এই সূত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় তার ফলেই শেষ পর্যন্ত ঐসব দেশের মানুষ তাদের স্বাধীনতা পেয়েছিল।

ইন্দোচীন ঃ ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওস নিয়ে গঠিত ইন্দো-চীনের ওপর ফ্রান্স দীর্ঘদিন ধরে তার ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা বজায় রেখেছিল। ভিয়েতনামে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে যে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় তা দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জাপানের আত্মসমর্পণের পরে ভিয়েতনামে ফরাসীরা

আবার যখন তাদের শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয় তখন হো-চি-মিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট দল সেখানে ব্যাপক প্রতিরোধ শুরু করে। উত্তর ভিয়েতনামে ঐ দলের প্রাধান্য বেশী থাকায় সেখানে একটি স্বাধীন ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামে ফরাসীরা শক্তি অর্জন করায় উত্তর ও দক্ষিণের মধে তীব্র সংঘর্ষ চলতে থাকে।

এরপর দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের পিছনে এসে দাঁড়ায় ফ্রান্সের পরিবর্তে আমেরিকা। ব্যাপক আমেরিকান সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য সত্ত্বেও দক্ষিণ ভিয়েতনামে 'জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্ট' একের পর এক অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। আমেরিকার সৈন্যরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে উপস্থিত হলেও এবং উত্তর ভিয়েতনামে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করলেও এই অভিযান স্তব্ধ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আমেরিকানারা সরে যেতে বাধ্য হলে দুই ভিয়েতনাম ঐক্যবদ্ধ হয়।

কাম্বোডিয়া ও লাওসে অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপানী অধিকারের সময় থেকে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়। ভিয়েতনামের আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে কাম্বোডিয়া ও লাওসের আন্দোলনকারীরা যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করেছিল। কাম্বোডিয়াতে সিহানুক জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। লাওসে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুপানুভঙ্গ।

ভিয়েতনামে আমেরিকার যুদ্ধ ক্রমশঃ লাওস ও কাম্বোডিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে এই দুই দেশের কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্রহ্ম ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তিতে জাপানী সৈন্যাপসারণের পরে ব্রহ্মদেশে ইংরেজরা আবার তাদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ব্রহ্মদেশের সর্বত্র তুমুল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল ব্রহ্মদেশের অ্যাণ্টি-ফ্যাসিস্ট পিপলস্ ফ্রীডম লীগ। আন্দোলনের তীব্রতা বুঝে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ঐ দলের সঙ্গে স্বাধীনতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু করে। সেই অনুসারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী এক চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ব্রহ্মদেশকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা দান করেন। স্বাধীনতা লাভের পরে ব্রহ্মদেশে আভ্যন্তরীণ নানাবিধ অসন্তোষ ও গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ক্রমে ব্রহ্মদেশের সরকার নানবিধ শাসন সংস্কারের মাধ্যমে ঐসব অসন্তোষের প্রতিকার করতে সচেষ্ট হয়।

মালয়েশিয়া : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানী অধিকারের আগে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মালয়েশিয়াতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে জাপানী অধিকারের সময় থেকেই সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। মালয়েশিয়াতে জাতীয়-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল 'ইউনাইটেড মালয় ন্যাশন্যাল অর্গানাইজেশন'. বিভিন্ন জাতি নিয়ে গঠিত মালয়েশিয়াতে জাতীয় আন্দোলন সম্প্রদায়গত বিভেদের দরুন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ইতিমধ্যে সেখানে কমিউনিস্ট আন্দোলনও জোরদারভাবে শুরু হয়েছিল। মালয়েশিয়াকে আর দীর্ঘদিন নিজেদের আয়ত্তে রাখা যাবে না বিবেচনা করে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা ঐ দেশকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। 1957

ইন্দোনেশিয়া : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপরাপর দেশের মত ইন্দোনেশিয়াতেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকলে। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল যখন জাপানীরা বুঝতে পারল যে তাদের মিত্রশক্তিবর্গের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই আগস্ট জাপানীরা আত্মসমর্পণ করবার আগে ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বকৃতি দেয়। এরপরে যখন ইংরেজরা সেখানে আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গেল তখন সেখানে সুরু হোল গোলমাল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ইন্দোনেশিয়া হল্যাণ্ডের অধীন ছিল। জাপানী সৈন্যদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্যই ব্রিটিশরা সেখানে সৈন্য নামিয়েছিল। হল্যান্ড সেখানে নিজ কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গেলে সুকর্ণর নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসাবে ইন্দোনেশিয়া আত্মপ্রকাশ করে। হল্যান্ড ইন্দোনেশিয়াকে মুক্তি দান করে।

১৯ জাতীয়তাবাদের প্রসার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উপনিবেশগুলিতে আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর সর্বত্র যে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তা পরাধীন জাতিসমূহের মনে জাগিয়ে তুলেছিল এক প্রচণ্ড উন্মাদনা। তাদের আশা ছিল যুদ্ধশেষে তারা তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ তা মেনে না নেবার ফলে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরবর্তী কালে দেখা যায় পৃথিবীর সর্বত্র পরাধীন জাতিসমূহ শুরু করেছে জাতীয় আন্দোলন। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জাতীয় আন্দোলন, যার মাধ্যমে সেই সব দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারই নয়, এশিয়ার অন্যান্য জায়গায়ও অনুরূপ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী দেশগুলোকে প্লাবিত করেছিল।

আটলাণ্টিক চার্টার:—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আটলাণ্টিক সনদ-এর ঘোষণা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দলিল হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেবল তাই নয়, এই ঘোষণা থেকেই জন্ম নিয়েছিল আজকালকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এক সনদ ঘোষণা করেন। এই সনদে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে, পৃথিবীর সব জাতিই ভয় ও অভাব থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে এবং নিরাপদে নিজ নিজ দেশে বসবাস করবে। এই ঘোষণাকে ভিত্তি করে রচিত হয় 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা'। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ২৬টি দেশের প্রতিনিধি ঐ ঘোষণায় স্বাক্ষর করলে ঐসব দেশে পরস্পর মতৈক্য পৌঁছাতে পেরেছিল। এই প্রচেষ্টা থেকেই জন্ম লাভ করেছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামে আন্তর্জাতিক সংস্থা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও উদ্দেশ্য:- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হল: (১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাবিধান করা (২) শান্তিভঙ্গকারী দেশের

বিরুদ্ধে সমবেতভাবে অগ্রসর হওয়া (৩) আন্তর্জাতিক কলহ উপস্থিত হলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তার মীমাংসা করা (৪) জাতিসমূহের সমান অধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া (৫) বিভিন্ন দেশ তথা জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা (৬) বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মিলিত কর্মের কেন্দ্রস্থল হবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ ও উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক শক্তির উত্থান ও আন্দোলনের বিকাশ। প্রায় সমগ্র পূর্ব ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক শাসন। ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশেও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে। এশিয়ায় চীনে সমাজতান্ত্রিক শক্তি বিজয় লাভ করে এবং সমগ্র ইন্দোচীনে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নেতৃত্বই জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে থাকেন। সমাজতান্ত্রিক শক্তির এই বিজয় উপনিবেশ বিরোধী আন্দালনে নতুন শক্তি সঞ্চার করে। এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মানুষ তাঁদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং এর ফলে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায় ঃ

১। আধুনিক যুগ বলিতে কি বুঝ? ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর

২। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবর্তন কিভাবে সাধিত হয়েছিল?

৩। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

৪। **টীকা লিখ ঃ** (ক) সমাজতন্ত্র (খ) বুর্জোয়া সম্প্রদায় (গ) ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

১। নবজাগরণ বলিতে কি বুঝ? ইতালি ও ফ্রান্সে নবজাগরণের বিকাশ সম্বন্ধে যা জান লিখ।

২। 'মানবতাবাদ' কাহাকে বলে? বিজ্ঞানের উন্নতিতে উহা কিভাবে সাহায্য করেছিল?

৩। নবজাগরণের কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের ভূমিকা বর্ণনা কর।

৪। **টীকা লিখ ঃ** (ক) দান্তে, (খ) পেত্রার্ক, (গ) চসার, (ঘ) সারভান্তেস, (ঙ) লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি, (চ) গুটেনবার্গ।

৫। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও ঃ

(ক) 'ডিভাইন কমেডি' কার লেখা?
পেত্রার্ক / বেকাচিও / দান্তে / রাফায়েল।

(খ) সারভান্তেস্ কে ছিলেন?
কবি / শিল্পী / বৈজ্ঞানিক / সাহিত্যিক।

(গ) 'শেষ বিচার' কার আঁকা?
লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি / গুটেনবার্গ / মাইকেল এঞ্জেলো / রাফায়েল।

(ঘ) টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন কে?
কোপারনিকাস / গ্যালিলিও / রোজার বেকন।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী আক্রমণের ফলে — পতন ঘটেছিল।

(খ) ইতালি ছিল প্রাচীন — সভ্যতার কেন্দ্র।

(গ) দান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ছিল —।

(ঘ) চসার ছিলেন — — অন্যতম দিকপাল।

(ঙ) ডন কুইক্‌সট্ গ্রন্থের রচনাকার —।

(চ) গুটেনবার্গ জার্মানির — নামক স্থানে প্রথম ছাপাখানা তৈরী করেছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

১। ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ সমূহ ব্যাখ্যা কর।

২। পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে মানুষের ধারণা কিভাবে স্পষ্ট হয়েছিল?

৩। জাতিসমূহের সংগঠন ও উত্থানে ভৌগোলিক আবিষ্কারের অবদান কি ?

৪। ভৌগোলিক আবিষ্কারে স্পেন ও পর্তুগালের উদ্যম সম্পর্কে যা জান লিখ।

৫। ভৌগোলিক আবিষ্কারর ফলাফল কি হয়েছিল ?

৬। টীকা লিখ : (ক) প্রিন্স হেনরী-দ্য-নেভিগেটার (খ) ভাস্কো-দা-গামা (গ) কলম্বাস (ঘ) ম্যাগেলান।

৭। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও :

(ক) জলপথে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেন কে ?

প্রিন্স হেনরী-দ্য নেভিগেটর / কলম্বাস / ভাস্কো-দা-গামা।

(খ) কলম্বাস কোথাকার অধিবাসী ছিলেন ?

স্পেন / পর্তুগাল / ফ্রান্স।

(গ) সর্বপ্রথম ভূ-প্রদক্ষিণ করেছিলেন কে ?

আমেরিগো ভেসপুচি / কলম্বাস / ম্যাগেলান।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) আলবুকার্ক ভারতবর্ষে এসেছিলেন ভাস্কো-দা-গামার অনেক — ।

(খ ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত — — কাছে উপস্থিত হন।

চতুর্থ অধ্যায় :

১। রেনেসাঁস ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

২। প্রতিবাদী ধর্মের প্রসার সম্বন্ধে যা যান লিখ।

৩। 'প্রতিসংস্কার আন্দোলন' কাহাকে বলে ? উহার গতিপথ বর্ণনা কর।

৪। দ্বিতীয় ফিলিপের আমলে নেদারল্যাণ্ডবাসীদের বিদ্রোহের কারণ কি ?

৫। ইংলণ্ডের সহিত দ্বিতীয় ফিলিপের সংঘর্ষ সম্বন্ধে যা যান লিখ।

৬। টীকা লিখ : (ক) মার্টিন লুথার (খ) ক্যালভিন (গ) অষ্টম হেনরী (ঘ) ইনকুইজিশন (ঙ) জেসুইট সংঘ (চ) পঞ্চম চার্লস ছ) আর্মাডা।

৭। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও :

(ক) কার নেতৃত্বে প্রথম প্রতিবাদী ধর্মের সৃষ্টি হয় ?

জন ক্যালভিন / অষ্ট হেনরী / মার্টিন লুথার।

(খ) জেসুইট সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

পঞ্চম চার্লস / মার্টিন লুথার / ইগ্নেশিয়াস লয়না।

(গ) আর্মাডা কোন্ দেশের যুদ্ধজাহাজ ছিল ?

পর্তুগাল / ইংলণ্ড / নেদারল্যাণ্ড।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) লুথারের নেতৃত্বেই প্রথম — ধর্মের সৃষ্টি হয়।

(খ) ক্যালভিন ব্যক্তিগত জীবনে — — — ছিলেন।

(গ) প্রতি-সংস্কার আন্দোলন ইউরোপে — যুদ্ধের সূচনা ঘটেছিল।

(ঘ) আর্মাডা — যুদ্ধ জাহাজ, — নাবিক একা প্রায় — সৈন্য নিয়ে গঠিত ছিল।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

১। ইংলণ্ডরাজ প্রথম চার্লসের সাথে পার্লামেন্টের দ্বন্দ্বের কারণ কি ?

২। ওলিভার ক্রমওয়েল কে ছিলেন ? তার সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৩। কোন্ বিপ্লবকে গৌরবময় বিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং কেন ?

৪। টীকা লিখ ঃ (ক) প্রথম চার্লস (খ) দ্বিতীয় জেমস্ স্টুয়ার্ট (গ) উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জ (ঘ) 'বিল অব্ রাইটস্'।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

১। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লিখ।

২। শের শাহের রাজত্বকালের স ক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। আকবরকে মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন ?

৪। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি ? আওরঙ্গজেব এর জন্য কতখানি দায়ী ?

৫ মুঘল শাসন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্টগুলি বর্ণনা কর।

৬। ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কারা সাফল্য অর্জন করেছিল এবং কিভাবে ?

৭। মারাঠা শক্তির উত্থান ও বিস্তার সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৮। রণজিৎ সিংহ কে ছিলেন ? শিখদের উত্থানে তাঁর অবদান কতটুকু ?

৯। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ (ক) হুমায়ুন কে ছিলেন ? (খ) মুঘল যুগে কোন্ কোন্ শহর গড়ে উঠেছিল ? (গ) মুঘল আমলে কয়েকজন বিদেশী পর্যটকের নাম বল ? (ঘ) আলবুকার্ক কে ছিলেন ? (ঙ) ১ম, ২য় ও ৩য় কর্নাটক যুদ্ধ কার কার মধ্যে হয়েছিল এবং ফলাফল কি হয়েছিল ? (চ) "মুকার চাকিয়া" কি ?

১০। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও ঃ

(ক) কত খ্রীস্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয় ?

১৫২৬ খ্রীঃ / ১৫৩০ খ্রীঃ / ১৫৩৯ খ্রীঃ।

(খ) 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্ম প্রবর্তন করেন কে ?

বাবর / শেরশাহ / আকবর / শাহজাহান।

(গ) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী কে ?
জাহাঙ্গীর / দারা / বাহাদুর শাহ / আওরঙ্গজেব।
(ঘ) জলপথে ভারতবর্ষে প্রথম কোন্ নাবিক আসে ?
ডুপ্লে / ভাস্কো-দা-গামা / আলবুকার্ক।
(ঙ) ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে 'অমৃতসরের চুক্তি' সাক্ষর করেন কে ?
শিবাজী / বাজিরাও / রণজিৎ সিংহ / মাধো সিংহ।

১১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
(ক) বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে — ভারতবর্ষে রাজত্ব শুরু করেন।
(খ) আকবর সব ধর্মমতের সারাংশ নিয়ে নতুন ধর্ম— প্রবর্তন করেছিলেন।
(গ) ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক — দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন।
(ঘ) রণজিত সিংহ বুঝতে পেরেছিলেন যে — একদিন — — নিজেদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে।

সপ্তম অধ্যায় ঃ (ক)
১। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়েছিল ? বর্ণনা কর।
২। নবাব সিরাজদৌল্লার সাথে ইংরেজদের বিরোধ এবং পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের কারণ বর্ণনা কর।
৩। লর্ড ক্লাইভ-এর নেতৃত্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিভাবে বাংলার সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল ?
৪। ইংরেজদের ভারতে সাম্রাজ্য গঠনে মারাঠারা প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেন ?
৫। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ঃ (ক) মীরজাফর (খ) মীরকাশিম (গ) টিপু সুলতান (ঘ) নানাফড়নবীশ।
৬। যেটি ঠিক তার পাশে √ চিহ্ন দাও।
(ক) কলিকাতার পত্তন করেছিল—
লর্ড ক্লাইভ / জব চার্ণক / লর্ড ডালহৌসি।
(খ) পলাশীর যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল—
মীরকাশীম / মুর্শিদকুলী খাঁ / মীরজাফর।
(গ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল—
১৭৫৭ খ্রীঃ / ১৭৮২ খ্রীঃ / ১৭৬১ খ্রীঃ / ১৭৬৫ খ্রীঃ।
৬। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
(ক) ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে — কাছে হন। (খ) লর্ড ক্লাইভ-এর — সর্বেসর্বা — উঠেছিল। (গ) ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে — সন্ধির মৈত্রী — হয়েছিল।

সপ্তম অধ্যায় ঃ (খ)
১। লর্ড ওয়েলেসলীর আগ্রাসী নীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। স্বত্ববিলোপ নীতি ঘোষণা করেন কে ? এই নীতির ব্যাখ্যা দাও।

৩। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ, প্রকৃতি ও ব্যর্থতার বর্ণনা দাও।

৪। ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—

(ক) লর্ড ডালহৌসী (খ) নানা সাহেব (গ) লক্ষ্মীবাই (ঘ) এনফিল্ড রাইফেল।

৬। যেটি ঠিক তার পাশে √ চিহ্ন দাও :—

(ক) অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক—

লর্ড ডালহৌসী / স্যার চার্লস নেপিয়ার / লর্ড ওয়েলেসলী।

(খ) আযোধ্যার নবাবকে পদচ্যুত করেছিল—

লর্ড ওয়েলেসলী / লর্ড ডালহৌসী।

৭। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক — 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি — করেছিলেন।

(খ) আবার সমুদ্র পথে — গোঁড়া হিন্দুদের — করে।

অষ্টম অধ্যায় :

১। অষ্টাদশ শতাব্দীকে 'যুক্তিবাদের যুগ' বলা হয়েছে কেন ?

২। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। স্বাধীনতা-যুদ্ধে আমেরিকার সাফল্যের কারণ এবং ফলাফল সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৪। ইংলণ্ডের শিল্প ও কৃষি বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। ফরাসী বিপ্লবের কারণ কি ? অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে এই বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :

(ক) জর্জ ওয়াশিংটন (খ) ইংলণ্ডের বয়ন শিল্প (গ) বাষ্পচালিত গাড়ি (ঘ) মেরী আতোয়ানিয়েৎ (ঙ) গিলোটিন (চ) নেপোলিয়ান বোনাপার্ট (ছ) ষোড়শ লুই (জ) মণ্টেস্কু।

৭। যেটি ঠিক তার মাথায় √ চিহ্ন দাও :

(ক) মাকু আবিষ্কার হয়—

১৬০৪ খ্রীঃ / ১৭১৩ খ্রীঃ / ১৭৩৩ খ্রীঃ

(খ) বাস্তিল দুর্গের পতন হয়—

১৫ই আগষ্ট / ১৪ই জুলাই

(গ) নেপোলিয়ানের মৃত্যু হয়—

১৭৮২ খ্রীঃ / ১৮২১ খ্রীঃ / ১৮২৯ খ্রীঃ

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) অষ্টাদশ শতাব্দীতে — চিন্তাধারা — দেওয়া হয়েছে।

(খ) — ১৩টি উপনিবেশ এক সঙ্গে — এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে সব — ঘোষণা করে।

(গ) তিনি বলতে লাগলেন — পাপ আরও —। সুতরাং — নয়।

(ঘ) মণ্টেস্কু — একজন উগ্র সমর্থক —। অনিচ্ছার — নেই।

(ঙ) শেষ পর্যন্ত — ইংলণ্ডের — তিনি নির্বাসিত হন।

নবম অধ্যায় :

১। ইউরোপে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য "ভিয়েনা সম্মেলনের" উপকারিতা বিশদ আলোচনা কর।

২। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। জার্মানির ঐক্য সাধনের বিস্তৃত বিবরণ দাও।

৪। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ কি ? এর ফলাফল কি হয়েছিল ?

৫। ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব ও তার ফলাফলের তাৎপর্য বর্ণনা কর।

৬। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও : (ক) মেটারনিক (খ) ম্যাৎসিনি (গ) কাভুর, (ঘ) গ্যারিবল্ডী, (ঙ) বিসমার্ক, (চ) আব্রাহাম লিঙ্কন, (ছ) কালমার্কস, (জ) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্।

৭। যেটি ঠিক তার মাথায় ✓ চিহ্ন দাও।

(ক) ভিয়েনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়—

১৭৮৫ খ্রীঃ / ১৮১৫ খ্রীঃ।

(খ) 'আঙ্কল টমস্ কেবিন' পুস্তকের রচয়িতা—

কালমার্কস / বিসমার্ক / মিসেস হ্যারিয়েট।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে, — শান্তি-শৃঙ্খলা — উদ্দেশ্য।

(খ) ম্যাৎসিনি — জন্মগ্রহণ করেন —।

(গ) নেপোলিয়ান বোনাপার্ট — তখন জার্মানিও পড়ে।

(ঘ) হাত-পা বাঁধা অবস্থায় — হত। — বিক্রি করা —।

(ঙ) 'দ্য ক্যাপিটাল' গ্রন্থে — পতন অনিবার্য।

দশম অধ্যায় ঃ

১। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীনে বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য কি পন্থা অবলম্বন করেছিল ?

২। প্রথম ও দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৩। 'একশত দিবসের সংস্কার' এর মূলকথা কি ?

৪। বক্সার বিদ্রোহের কারণ কি ? এবং এর ফলাফল কি হয়েছিল ?

৫। চীনের মুক্তি আন্দোলনে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের অবদান কি ছিল ?

৬। সম্রাট মুৎসোহিতো কে ছিলেন ? তার কার্যাবলীর বিবরণ দাও।

৭। চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

টীকা লিখ ঃ

(ক) একশত দিনের সংস্কার, (খ) 'তুং মেংহুই', (গ) মিকাডো- (ঘ) 'একুশ দফা দাবি'।

সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও ঃ

(ক) বক্সার বিদ্রোহ হয়েছিল—

জাপান / চীন / রাশিয়া।

(খ) চীন-জাপান যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল—

জাপান / চীন।

(গ) তুং মেং হুই দল গঠন করেন—

জু-সি / ইউ-য়ান-সিকাই / ডাঃ সান ইয়াৎ সেন।

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) বক্সাররা অপদার্থ — — বংশের উচ্ছেদ সাধন করে এবং বিদেশীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে নতুন — গঠনের উদ্দেশ্যে — শুরু করেছিল।

(খ) ডাঃ সান ইয়াৎ সেন চীনাদের জাতীয়তাবাদী আদর্শে দীক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে — নামে একটি দল গঠন করেন।

(গ) এমত অবস্থায় জাপানীরা দাবি জানাতে থাকে যে — তার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

একাদশ অধ্যায় ঃ

১। মহারাণীর ঘোষণাপত্র কি ? ব্যাখ্যা দাও।

২। ভারতে ইংরেজ সরকারের অনুসৃত বৈদেশিক নীতির বিবরণ দাও।

৩ সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা কি ছিল ?

৪। জাতীয়তাবোধের ক্রমবিকাশ কি ভাবে ঘটে লিখ ?

৫। জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ছিল কেন ?

৬। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে চরমপন্থীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৭। টীকা লিখ : (ক) ভারত সচিব; (খ) লর্ড ক্যানিং, (গ) গণ্ডমকের সন্ধি, (ঘ) লর্ড রিপন, (ঙ) বিধবা-বিবাহ, (চ) অক্টোভিয়ান হিউম।

৮। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও :

(ক) ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কে ? লর্ড ক্যানিং / লর্ড রিপন / লর্ড লিটন

(খ) বিধবা-বিবাহের প্রচলন করেন কে ?
রাজা রামমোহন/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর / দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহূত হয়েছিল কোথায় ?
কলিকাতা / দিল্লী / বোম্বাই / মাদ্রাজ

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ইতিপূর্বে কোম্পানির ডিরেক্টার-সভাও বোর্ড অফ কন্ট্রোল যেসব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাদের সেইসব ক্ষমতা এখন দেওয়া হয় ইংলণ্ডে —।

(খ) মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজাদের আশ্বস্ত করবারজন্য এক—জারী করেন।

(গ) এমতাবস্থায় — বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের অজুহাতে ভারত সরকার ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে — আক্রমণ করে।

দ্বাদশ অধ্যায় :

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ কি ?

। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানির দায়িত্ব কতখানি ?

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল লিখ।

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ও যুদ্ধ চলাকালীন ভারতের মধ্যে ও ভারতের বাইরে বিপ্লবীদের কার্যকলাপের বিবরণ দাও।

৫। ভারতীয় নেতারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন কেন ?

৬। রাওলাট বিল ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া ভারতের স্বাধীনতা কর্মীদের মধ্যে যে আলোড়ন এনেছিল তা বিশ্লেষণ কর।

৭। হোম রুল আন্দোলন কিভাবে বিস্তার লাভ করে ?

৮। জাতীয় নেতৃত্বে মহাত্মা গান্ধীর উত্থান বর্ণনা কর।

৯। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) লক্ষ্নৌ চুক্তি কি ? (খ) খিলাফৎ আন্দোলন কেন হয়েছিল ?

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ

১। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসানের কারণ কি ?

২। রুশ-বিপ্লব কাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল এবং কেন ?

৩। রুশ বিপ্লবের অগ্রগতির নায়ক কে ছিলেন ? তাঁর কার্যাবলীর বিবরণ লিখ।

৪। অন্যান্য দেশে রুশ-বিপ্লবের প্রভাব কতখানি প্রতিফলিত হয়েছিল ?

৫। টীকা লিখ ঃ দ্বিতীয় আলেকজান্ডার (খ) লেনিন (গ) 'বেস্ট-লিটভাস্ক-এর সন্ধি (ঘ) তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা।

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ

১। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের ফলাফল কি হয়েছিল লিখ।

২। ভার্সাই সন্ধির মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ?

৩। মুসোলিনী কে ছিলেন ? ইতালীতে তাঁর কার্যকলাপের বিবরণ দাও।

৪। এডলাফ্ হিটলার কে ছিলেন ? তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নাৎসী দলের কার্যকলাপ বর্ণনা কর।

৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য হিটলারকে কতখানি দায়ী করা যায় ?

৬। জাতি সংঘ কি ? ইহার উদ্দেশ্য কি ছিল ?

৭। শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কতখানি সাফল্য অর্জন করেছিল ?

৮। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে কোন্ চারিটি শক্তির প্রাধান্য ছিল ?

(খ) সেন্ট জার্মেইনের সন্ধির সর্ত কি ?

(গ) ফ্যাসিবাদ কি ? (ঘ) নাৎসীবাদের উত্থান কি করে হয়েছিল ?

(ঙ) মেঁই ক্যাম্পফ' গ্রন্থটি কার লেখা ? (চ) জাতি সংঘের সনদ কি ?

১০। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও ঃ

(ক) ফ্যাসিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা ছিলেন—লেনিন / হিটলার / মুসোলিনী

(খ) প্যারিস শান্তি সম্মেলন হয়েছিল—১৯১৪ / ১৯১৯ / ১৯০৯ / ১৯১৭

(গ) হিটলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন —রাশিয়ার/ইতালীর/জার্মানীর/ফ্রান্সের'

১১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) — — নামে জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে ইতালীতে ফ্যাসিস্ট দল গঠিত হয়েছিল

(খ) হিটলার নিজেকে জার্মানীর সর্বপ্রধান নেতা বা —বলে ঘোষণা করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেন হয়েছিল? এর জন্য 'ভার্সাইচুক্তি' কতখানি দায়ী? এর ফলাফল কি হয়েছিল?

২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (ক) জার্মানীকে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে হিটলার কতখানি সাফল্যলাভ করেছিল? (খ) হিটলারের আগ্রাসী নীতির ফলাফল কি হয়েছিল?

৩। যেটি ঠিক তার মাথার √ চিহ্ন দাও ঃ

(ক) ভার্সাইচুক্তির ফলে জার্মানির লাভ হয়েছিল / ক্ষতি হয়েছিল। (খ) জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল / দায়ী ছিল না। (গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল জাপান / জার্মানি।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ (ক) চেকোশ্লোভাকিয়ায় — হচ্ছে — হিটলার — করে নেন। (খ) এর ফলে জার্মান — সালের — করে। — সমর সজ্জা। (গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ — সঞ্চার করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে — উঠেছিল।

ষোড়শ অধ্যায় ঃ

১। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজীর অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন কতটা সাফল্যলাভ করেছিল? বিশদ বর্ণনা দাও।

২। জাতীয় আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিকদের অবদান কতটা? তাদের আন্দোলন সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ঃ (ক) নেতাজী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ্ বাহিনী। (খ) সূর্য সেন ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। (গ) চৌরিচৌরার কৃষক সংগ্রাম। (ঘ) গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযান ও লবণ আন্দোলন। (ঙ) ক্রিপস্-এর দৌত্য।

৪। যেটি ঠিক তার মাথায় √ চিহ্ন দাও ঃ

(ক) বুড়িবালামের তীরে ইংরেজ বাহিনীকে পরিচালনা করেন জেনারেল ও ডায়ার / চার্লস টেগার্ট

(খ) ভারতের 'ভাইসরয়' হয়ে এসেছিলেন —এ্যাটলী মাউণ্টব্যাটেন ক্রিপস্

(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় — ১৯২৩ / ১৯২৬ / ১৯৩৯

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) আবদুল গফ্ফর খানের — স্বর্ণাক্ষরে —। — লালকোর্তা বাহিনী শান্তিপূর্ণভাবে। — কম হয়নি। (খ) সেই সময় — অনাহার — দিয়েছিল। — সূচনা — করে — লবণ তৈরী — না। — ব্যবসা।

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ

১। ইউ-য়ান-সিকাই ও সান ইয়াৎ সেনের মধ্যে বিরোধের কারণ কি ?

২। দেশ গঠন কার্যে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের অবদান কি ?

৩। লং মার্চ কি ? সিয়ানের ঘটনাবলীর বিবরণ দাও।

৪। চিয়াং কাইশেক কে ছিলেন ? তাঁর শাসনকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী কি ?

৫। চীনের বিপ্লবান্দালনে মাও-সে-তুং-এর ভূমিকা কি ছিল ? এই আন্দোলনে তিনি কতটা সফলতা অর্জন করেছিলেন ?

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (ক) ইউ-য়ান-সিকাই কে ছিলেন ? (খ) দীর্ঘ পদযাত্রার কারণ কি ?

৭। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও ঃ

(ক) ডাঃ সান ইয়াৎ সেন — কমিউনিস্ট ছিলেন / ছিলেন না।

(খ) চীনা গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন

ডাঃ সান ইয়াৎ সেন / চিয়াং কাইশেক / মাও সে তুং

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ — প্রজাতান্ত্রিক চীনের — নির্বাচিত হন।

(খ) সান-ইয়াৎ-সেনের আদর্শগু — নামে খ্যাত।

(গ) কিয়াং সি থেকে — প্রদেশে কমিউনিস্টদের যাত্রা ইতিহাস '—' নামে খ্যাত।

অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ

১। ইন্দোচীনের উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত [illegible]

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (খ) ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ (গ) মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা লাভ।

উনবিংশ অধ্যায় ঃ

১। বিশ্বশান্তির ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা বর্ণনা কর।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন কিভাবে বিকাশ লাভ করে (খ) আটলান্টিক চার্টার কি ?

———

